ভালোবাসা বিভ্রাট

ভালোবাসা বিভ্রাট

সংকলনে ও সম্পাদনায়
আব্দুল্লাহ

বিক্রয়ের জন্য নয়

v4

www.BiBiJAAN.com

BiBijAAN.com প্রকাশিত কোন বই-ই বিক্রির জন্য নয়।
বইয়ের প্রতিটি প্রবন্ধের লেখসত্ব প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব।

ভালোবাসাগুলো পবিত্র থাক,
ভালোবাসাগুলো ভালোবাসার সঠিক সংজ্ঞা খুঁজে পাক,
ভালোবাসাগুলো সব সুখে থাক,
ভালোবাসাগুলো জান্নাত পর্যন্ত টিকে থাক,
এই কামনায়...

সূচিপত্র

০৮	**তাই স্বপ্ন দেখবো বলে আমি দু'চোখ পেতেছি**
	স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ
১৬	**ভালোবাসা, ভালোবাসি! ভালোবাসতেই হবে?**
	অবুঝ বালক
২৯	**আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ কোন সে বাঁধনে**
	স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ
৩৫	**আমার স্বামীর ডায়েরি**
	আনিকা তুবা
৫৮	**সখী ভালোবাসা কারে কয়**
	স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ
৬৪	**একজন বোনের প্রশ্ন এবং তার উত্তর**
	অবুঝ বালক
৭৩	**সখি**
	শিহাব আহমেদ তুহিন

৮২	**বারসিসা**
	অবুঝ বালক
৯২	**এ্যাডাম টিজিং**
	শরীফ আবু হায়াত অপু
১০০	**লাভ এট ফার্স্ট সাইট**
	শিহাব আহমেদ তুহিন
১১২	**আধার আলো**
	আনিকা তুবা
১২৯	**প্রেম-বিয়ে সংস্কৃতি এবং অসুস্থ দুষ্টচক্রগুলো**
	স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ
১৩৮	**ক্রাশনামা**
	হুজুর হয়ে
১৪৪	**কোথায় পাবো তারে**
	শরীফ আবু হায়াত অপু
১৫১	**বিয়ে কি এমনই হওয়া উচিত?**
	স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

১৫৮	**বিয়ে**
	রেহনুমা বিনতে আনিস
১৬৭	**বিষ বিষই, মধু না**
	শাহ্ মুহাম্মদ তন্ময়
১৭১	**ফ্যান্টাসি**
	জুবায়ের হোসাইন
১৭৪	**জীবন্ত মৃত**
	রওনক আফরোজ রিপা
১৮০	**বিবিধ প্রশ্ন**
	শিহাব আহমেদ তুহিন
১৮৮	**আঁকড়ে ধরো**
	অবুঝ বালক

তাই স্বপ্ন দেখবো বলে আমি দু'চোখ পেতেছি

আমরা একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের একটা সময় অতিক্রম করছি এখন। সময়টা কঠিন যাচ্ছে। এমন কঠিন সময় হয়ত যুগে যুগেই নির্দিষ্ট বিরতি পর পর আসে। যুগের বিচার করলে আমাদের চলে না। আজ থেকে মাত্র ১০০ বছর আগে এই পৃথিবীতেই ঘটে গিয়েছিলো নারকীয় বিশ্বযুদ্ধ। হানাহানি-খাদ্যমন্দা-ক্ষমতা দখলের লড়াইতে ডুবে ছিলো সমগ্র বিশ্ব। অনেকেই অনেক অর্জন করেছে, তারপর বছর বিশ যেতে না যেতেই আবার আরো বড় ভয়ংকর সময় — সেই ক্ষমতা খাটানোর যুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকিকে বিষাক্ত করে দিয়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণনাশ করে দিয়ে আমেরিকান জাতিগোষ্ঠী বিশ্বকে কব্জা করেছে আপন কৌশলে। অথচ তার দুইশ বছর আগেও ব্রিটিশ সূর্য ডুবতো না কোথাও। এমন আরো অজস্র চোখ দিয়ে দেখা যাবে "সময়" গুলো। আরেকটু উপরে উঠি? যখন সভ্যতাগুলো হারিয়ে গেলো। ফারাওদের মিশর, মেগাস্থিনিস, ব্যাবিলন, ইনকা, মায়া, পাল সাম্রাজ্য, সেনদের রাজত্ব, অটোমান এম্পায়ার — অমন শত শত সভ্যতা পাওয়া যাবে হয়ত যদি হিসেব করি এই সৃষ্টির শুরু থেকে। কিন্তু তাদের অমন হিসেব করে আমাদের লাভ নেই। সভ্যতা টেকে কয়েকশত বছর। আমরা বাঁচি খুব বেশি হলে অর্ধশত বছর।

আমরা বাস করছি বিদ্যুত সভ্যতায়। মাত্র দু'তিনশ বছর আগে উদ্ভাবিত বিদ্যুত দিয়ে গত পঞ্চাশ বছরে প্রযুক্তিতে উন্নত হয়েই মাটিতে আমাদের আর পা পড়েনা। আমরা বুর্জ আল আরব বানাই, আমরা বানাই পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার, মনোহারি সিয়ার্স টাওয়ার, স্ট্যাচু অব লিবার্টি, আইফেল টাওয়ার। আমরা দম্ভে আর বড়ত্বে গলা ফুলিয়ে দিই। অথচ প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চে যখন কয়েকটা হিমালয় ডুবে যাবে শুনি — মনে হয়না ওই উঁচু হিমালয়, আর অমন গভীর খানা-খন্দটা কে তৈরি করলো! প্রকৃতি নামের শব্দটা দিয়ে লেখকমহল চালিয়ে দেন অগভীর চিন্তার পাঠকদের মনকে বাঁকিয়ে দেবার জন্য — আমরাও সন্তুষ্ট হই।

কিন্তু অমন পিরামিড বানালেন যারা, আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর বা পিসার হেলানো মিনার যারা বানালেন — তারা কোথায় চলে গেলেন? মরে গেলেন তো কেন আর কোন চিহ্নই রইলো না তাদের? কত বেশি দুর্বল সেই সভ্যতার এই ধারক ও বাহকদল — কতনা ক্ষণস্থায়ী এই বিপুল দম্ভযজ্ঞ, সৃষ্টিযজ্ঞ আর ক্ষমতাযজ্ঞ!

এসব সভ্যতা আসবে যাবে। একসময় আদ জাতি ছিলো, সামূদ জাতি ছিলো। দম্ভে আর জুলুমে তারা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো সবাইকে। পৃথিবীর ইতিহাসের সবচাইতে ক্ষমতাধর জাতিকেও আল্লাহ এক মূহুর্তেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। কওমে লূতের মাঝে "সমকামিতা" প্রকটভাবে দেখা দিয়েছিলো, তারা শুনেনি তাদের নবীর বলা কথাগুলো — মাটিচাপা পড়ে, প্রকট শব্দে কানে তালা লেগে সমস্ত জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। পবিত্র কোরআনে এই পৃথিবী আর নভোমন্ডলসহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেই দিয়েছেন — তিনি অনেক জাতিকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন তাদের "কাজের জন্য"। তিনি জানিয়েছেন আমাদের মাঝে কেউ যদি তার দাসত্ব না করে, আল্লাহ তাদের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে সেখানে আরেকটা জাতিই সৃষ্টি করে দিতে পারেন — নিঃসন্দেহে এটা তার জন্য কোন ব্যাপারই না। কিন্তু আমরা যখন সেই কোন একটি জাতিস্বত্ত্বার অংশ — তখন সেটা আমাদের জন্য "ব্যাপার"।

আমাদের জীবনের প্রতিটি দিনই আমাদের জন্য ব্যাপার। আমাদের একটা জীবন একবারের জন্যই। এই আত্মা, এই দেহ আর জীবন — **একবারের** জন্যই।

আমরা নিশ্চয়ই অবলীলায় ভেসে দিতে পারিনা আমাদের জীবন — আমরা অবশ্যই চাইনা একটা নিশ্চিত ভয়ংকর পরিণতি। এমন উদ্দেশ্যহীন বর্বর লোভী, জালিম আর কামুক সমাজ তৈরি করে যে জাতি - তার অংশ হওয়ায় আমাদের ভালো কাজের অ্যাকাউন্টে অনেক কিছু জমা থাকলেও — সেই পুরো ব্যাঙ্কটাই মহান অধিপতি করে দিবেন "সিলড"। তাইতো খেয়ে দেয়ে, ঘুমিয়ে, চাকুরি করে দিন অতিক্রম করার পরেও

মহান সর্বশক্তিমানের দাসত্বের কতখানি আমরা প্রত্যেকে/পরিবারসহ/এই পুরো জাতি মিলে করছি তা চিন্তা করার দায় থেকে যায় সবারই।

নইলে একদম শেষে সকল প্রাপ্তিই হয়ত মাল্টিপ্লাইড হবে শূণ্য দিয়ে,

(ধনসম্পদ * প্রতিপত্তি * সম্মান * যশ * জ্ঞান) * শূণ্য = শূণ্য **[ভিখিরী]**

এখন চিন্তা করার বিষয় রয়ে যায় — আমরা কি হাশরের ময়দানের বিশাল প্রান্তরে ভিখিরি বেশে দাঁড়াতে চাই?

আমি চাকুরি করি একটা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক "আধুনিক প্রজন্মের" তরুণ। আমাদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলে আলাপ। প্রায়ই টপিক আসে "গার্লফ্রেন্ড-বিয়ে-মেয়ে"। একদিন সহসা লম্বা চওড়া আলাপ হলো– আমি শ্রোতা টাইপের। কিছু কিছু আলাপে সবার প্রবেশের ফাঁকফোকর থাকে না। তাই ওয়েস্টিন, রুচিতা বার, ভুত, রেস্তোরা, পিজা হাট, কেএফসি গুলশান ধানমন্ডির কিছু কিছু প্লেসের রঙ্গিন আলাপ চলতে থাকলে অন্য কাজে মন দিলাম। এলো বিয়ের আলাপ। প্রশ্ন আমার দিকে। কেন প্রেম করিনা — এ নিয়ে কিছুক্ষণ হাসি তামাশা। ইদানিং ছেলে মহলে একটা কথা খুব শুনি — "লাভ ম্যারেজ মানে নিজের গার্লফ্রেন্ড, অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ মানে অন্যের গার্লফ্রেন্ড"। আমি এই প্রসঙ্গেও কথা বলিনা, শুধু স্মিত একটা হাসি উপহার দিই ওদের।

একজন অভিজ্ঞতা বলছিলেন নিজ জীবনের — কীভাবে তিনি স্কুলগামী একটা মেয়ের সাথে প্রেম করেছিলেন, কতবার চাকুরিজীবী বাবা মায়ের সেই মেয়েটির বাসাতেই শয্যাগমন করেছেন, কীভাবে মেয়েটা রিলেশন ব্রেক করে *আপ* রিলেশনে চলে গেলো — কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই।

তারপর একজন বলতে শুরু করলো তাদের ভার্সিটিতে (ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে) কীভাবে ক্লাসের মধ্যেও ছেলে-মেয়ে আদিম আনন্দের স্বাদ নিতো। অমন কমপক্ষে ১০-১৩টা গল্প। সত্য-মিথ্যা জানিনা, আমি স্তব্ধ হয়ে শুনি। বরফশীতল হয়ে জমে যাওয়া দেহে রক্তসঞ্চালনের চেষ্টা করতে থাকি।

আমার দিকে তাকিয়ে একজন কলিগ বলতে থাকে — "তুমি এই জেনারেশনে এমন কোন মেয়ে আশা করতে পারো না বিয়ে করতে গিয়ে, যে *ইউজড* না"! তার পরপরই আবার বলে "টাকা-পয়সা না থাকলে বউ *বাঁধতে* পারবা না, তোমাকে অনেক টাকা থাকতে হবে, নইলে বউ তোমার অফিসে থাকার সময়ে পাশের বাড়ির ছেলেটার সাথে ফোনে কথা বলবে, তারপর..."।

আমি আর সহ্য করতে পারিনি, শক্ত গলায় বলে উঠেছিলাম — "দুঃখিত আমি একমত না। এই সমাজে আমার মতন দুর্বল আত্মার একটা ছেলেও যখন এমন ভয়াবহতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে, এমন কেউ আমার জন্য আছেই যে আমার মতন করেই আমার মতন কারো জন্য অপেক্ষা করছে। সমস্ত মেয়েদের এক করে দিলে হবেনা কেননা আমি আমার বোনদের মতন অনেক মুসলিমাহ বোনদের চিনি **যারা অসম্ভব সুন্দর অন্তকরণকে ধারণ করে**"।

যাদের চোখে পৃথিবী কেবলই কেনাকানা, গয়নাগাটি, সাজগোজ আর গাড়ি-বাড়ির না। **তাদের কাছে এই জীবনটার একটা আলাদা অর্থ আছে**। তাদের কাছে ব্র্যাডপিট-নিকোল কিডম্যান, শাহরুখ-গৌরি, প্রভা-রাজিবরা দাম্পত্য জীবনের আইকন না। তাদের কাছে আইডল হলো হলো ফাতিমা, আয়িশা, আসিয়া, খাদিজা নামের কিছু পবিত্র আত্মা।

মুসলিম যারা, তাদের আইডল তথা আদর্শ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যার জীবনে দারিদ্র ছিলো আগাগোড়া বন্ধু। আরবের ইসলামী রাস্ট্রের এই নেতা বিয়ের

অনেকগুলো বছর পরেও মোহরানা আদায় করতে না পারায় স্ত্রী আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে নিজ বাড়িতে তুলে নেয়ার সুযোগ করতে পারেননি।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন জরুরি ফান্ডে দান করতে কিছু জিনিস নিয়ে যাবার পর তাকে প্রশ্ন করা হলো বাড়িতে কি রেখে এসেছেন — তিনি উত্তর দিয়েছিলেন আল্লাহ ও তার রাসূলকে। কারণ তার ঘর ছিলো শূণ্য! এমনই ছিলেন তারা, আর তাদের সহধর্মিনীগণ ছিলেন অমনই। কই, তারা তো *বউ বাঁধতে* বাড়ি-গাড়ি-ঐশ্বর্যে মুড়িয়ে রাখতেন না (যদিও তা করার সুযোগ তাদের ছিলো)।

সেই আদর্শের বলে দাস যায়িদ বিন হারিসা সন্তান পেতেন উসামা বিন যায়িদদের মতন। যাকে নবীজী (সা) মাত্র উনিশ বছর বয়েসে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন, যার নেতৃত্বে অনেক প্রবীণ সাহাবাও তাগুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন — স্থাপন করে গেছেন অনুপম দৃষ্টান্ত। তাদের ছোটো একটা বাহিনীর কাছে প্রবল প্রতাপশালী রোমান সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো।

আমার আইডল তো সেই ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম, যিনি একজন অতিথি ছাড়া খেতেই বসতেন না। আমাদের আইডল হলেন আইয়ুব আলাইহিস সালাম — যিনি দীর্ঘদিন ছিলেন প্রচন্ড রোগগ্রস্ত, তবু ছিলেন প্রশান্ত আত্মায় তার রবের কৃতজ্ঞ দাস।

আমি সেই দ্বীনকেই জীবনবিধান হিসেবে মানি — যা সৃষ্টির শুরুতেও ছিলো, যা থাকবে বিশ্বজগত ধ্বংস অবধি। আমি সেই নৌকায় উঠতে পারি বা না পারি, এই দ্বীন ইসলামই বিজয়ীদের আরোহণের যান — যা নিয়ে যাবে সফলতার মঞ্জিলে।

বউ বাঁধতে টাকা কামানোর আইডিয়ায় মগ্ন থেকে, ক্রমাগত অন্যের সাথে নিজেকে বড় করার টেক্কা দিতে দিতে, নিজেকে খুউল আর ইয়ো স্মার্ট বানানোর নেশাময়তায় ইনভলভ করতে শেখায়না আমার এই দ্বীন। আমাদের, আমাদের সমস্ত ভালোবাসা

আল্লাহর জন্যই। সেই ভালোবাসায় সিক্ত আমি যেখানেই যাই, জীবনের প্রয়োজন সামলে ঘরে ফিরে যাবো প্রিয়জনের কাছে — আবেগ আর ভালোবাসা ভাগাভাগি করতে।

আমরা বিয়ের আয়োজনে কেবল আল্লাহর স্মরণে একটা দোয়া করতে উন্মুখ থাকি — যেন আমাদের নতুন এই বন্ধন তার দাসত্বের জন্যই হয়। যেন দুজনের এই বন্ধন পৃথিবীর জীবন ছাপিয়ে কবর, হাশর, পুলসিরাত, মীযান পেরিয়ে জান্নাতেও অটুট থাকে। যেন দু'জন এই নতুন ভালোবাসার গ্ল্যামার নিয়ে থাকি অনন্তকাল, যেমন ছিলেন আমাদের আইডলেরা। আমরা জানি আমাদের ভালোবাসা নশ্বর নয় — আমাদের ভালোবাসা হলো আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসার আলোকে উদ্ভাসিত। আমাদের বিশ্বাসের কমতি হবেনা কখনই। আমাদের সম্মানের ঘাটতি হবেনা কখনই। আমরা সবসময় নিজেদের শোধরাতে শিখি। তাই আমাদের ভুল বুঝাবুঝি রবে না বেশিক্ষণ। আমাদের মৃত্যুবধি আমরা নিজেদের উন্নত করি আত্মিকভাবে।

আমরা কখনই হারিয়ে যাইনা সময়ের নষ্টদের দখলে যাওয়া প্রচারণার কাছে, আমরা কখনই হারিয়ে যাইনা প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় মোহাচ্ছন্ন হওয়া গাফেলদের উঁচু উঁচু অট্টালিকা মতন অহংকার দেখে। আমরা জানি, আমরা মানুষকে, মানবতার জন্য নিজেদের বিলাই লোক দেখাতে না — কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবার আশায়। আমরা খুব ভালো করে জানি, আমাদের প্রতিটি মূহুর্তের কাজ ও মনের চিন্তা-অনুভূতিরা রেকর্ডিং হচ্ছে — যার কিছুই গোপন থাকবে না, তা থেকে রক্ষা পাবো না আমরা কেউই। মরুর বুকে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতিকে আলোয় উদ্ভাসিত করেছিলো যেই দ্বীনের পূর্ণাবয়ব আমরা সেই সে দ্বীনের অনুসারী।

মুশরিক সর্দার আবু জাহলের ছেলে ইকরিমা জীবনভোর মুসলিমদের বিরোধিতা করেছিলেন, হিন্দ বিনতে উতবা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় চাচা

হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার পর কলিজা চিবিয়েছিলেন। অথচ পরে তারা যখন অনুতপ্ত হয়ে তারা নবীজীর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন — পেয়েছিলেন, হয়েছিলেন রাদিয়াল্লাহু আনহুম, আনহুমা। আর দ্বীনকে গ্রহণ করে নেয়ার পর তাদের জীবন ও চরিত্রও ছিলো অন্যরকম সুন্দর। এই উদার ভালোবাসাময় সুন্দরতম দ্বীন ইসলাম হলো আমাদের আদর্শ! এই সুন্দরতম জীবনবিধান আমাদের সম্পদ।

আমাদের সামনে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো, রাস্তার বিলবোর্ডগুলো, পত্রিকা-ম্যাগাজিনগুলো যতই হতাশা প্রচার করুন না কেন, প্রাচূর্যের নেশায় চুর হয়ে যাওয়া ব্যবসায়ীরা যতই ভয়াবহ সমাজ তৈরি করুক না কেন, আত্মিক মুক্তির জ্ঞানে মূর্খ শাসকদল আমাদের যতই শোষণ করে ছিবড়ে করে দিক না কেন, আমরা জানি আমাদের অন্তরের আলোতেই আমরা মুছে দেবো এই অন্ধকারের নোংরামি, কদর্যতা। আমাদের কর্মের আলোতে, অন্তরের ভালোবাসায় সিক্ত হবে অভাবীরা, মজলুমেরা, মানবতা। রূপালী আর সোনালী পর্দার প্রচারণায় পণ্য হওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে সম্মানিত হবেন আমাদের মা-বোনেরা এই দ্বীনেই স্পর্শেই। আমরা তো হতাশ নই! আমরা নোংরা মনের লোকের নোংরা কথায় দুঃখের সাগরে ভেসে হতাশ হয়ে "আনইউজড" মেয়ে খুঁজতে প্রেম করার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়িনা। আমরা প্রতিদিন সালাতের পরে, ইবাদাতের পরে হাত দুটি তুলে দোয়া করি,

"রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াযিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা ক্বুররাতা আ'ইয়ুনিন ওয়া জা'আলনা লিল মুত্তাক্বিনা ইমামা"

যার অর্থঃ "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর" [২৫:৭৪]

আমরা জানি, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সমস্ত দোয়া কবুল করেন এবং দোয়ায় ভাগ্য ফিরায়। তাইতো এই ভয়ংকর সময়েও আমরা স্বপ্ন দেখি সুন্দরের, প্রশান্ত আত্মার।

এই স্বপ্ন কোন ক্ষুদ্র স্বপ্ন নয়– স্বপ্নের সুতোর এই প্রান্তে মালা গাঁথছি যখন, অন্য প্রান্তেও তখন আমাদের হয়ে মালা গেঁথে যাচ্ছে জান্নাতে, যেখানে শান্তিই শান্তি। আমাদের কাজই তো তৈরি করে দেয় আমাদের ভবিষ্যত, যে ভবিষ্যত অনন্ত কালের। যা সুন্দর কর্মের মানুষদের জন্য অনন্ত সুন্দর, অনন্ত শান্তির, সুখস্বপ্নের!

ভালোবাসা, ভালোবাসি! ভালোবাসতেই হবে?

- দোস্ত কোনদিন প্রেম করেছিস??

- না মানে ইয়ে.....বিষয়টা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে

- আরে এটা হইল গিয়ে জলের মত সহজ! খালি মাইয়ার ফোন নাম্বারটা নিবি, কিছুক্ষণ ভুজুং ভাজুং দিবি! ব্যস প্রেম হয়ে গেল!

- বলিস কি? এত্ত সহজ?

- তুই না পারলে আমারে দিস। পটাইয়া তোরে দিয়া দিমু!

- না মানে ইয়ে...পটাবি তুই, প্রেম হবে তোর সাথে আবার আমার কাছে আসবে কিভাবে?

- তুই কি মনে করিস? আজকাল পুলা মাইয়ারা যার সাথে প্রেম করে তাঁর সাথে কবুল বইলা সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে থাকে? প্রেম প্রেম ভাব নিয়ে এরা একটা সঙ্গী খোঁজে! সেটা আমি হলেও যা তুই হলেও তা!

এটা অনেক আগে এক বন্ধুর সাথে আমার আলাপচারিতা। এরপর থেকে আজ অবধি জীবনের এই ছোট পরিক্রমায় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের আনাচে কানাচে বিদ্যানদের সংস্পর্শে এসে অনেককিছু জেনেছি, শুনেছি, বুঝেছি। এই ধরণের অনুভূতিনির্ভর বিষয়গুলোতে আমার চিন্তা বেশ ভালো কাজ করে কিন্তু প্রতিভার সবটুকু খরচ করেও "ভালোবাসা" নামক বিষয়টাকে কোন ব্যাকরনিক সংজ্ঞায় আনতে পারলাম না।

প্রচলিত ধারায় আমাদের চারপাশের তরুণ তরুণীদের ভাবালুতামার্কা বোধহীন আবেগের নাম যে ভালোবাসা নয় সে বিষয়ে অবশ্য আমার কোন সন্দেহ নেই। চারপাশের মানুষগুলোর ভালোবাসা নামের অতি পবিত্র বিষয়টা নিয়ে অবিশ্বাস্য রকম অর্থহীন, জঘন্য এবং জোর করে মাথায় ঢুকানো সস্তা আবেগে মিশে যাওয়া দেখে অবাক লাগে। ভালোবাসা যেখানে একটা অনুভূতির ব্যাপার সেখানে আমরা আচরণ

করি রোবটের মত, অন্ধ-কানা-বোবার মত। ভোগবাদী, সেকুলার এই সমাজে অন্য সবকিছুর মতই মানুষের অন্তরের একান্ত আপন অনুভূতিও আজ যেন ফর্মালিটি মেইনটেইন করা। ভালবাসতেই হবে, একটা বয়ফ্রেন্ড / গার্লফ্রেন্ড লাগবেই, এই করতে হবে, সেই করতে হবে..... হবে... হবে..... হবেই হবে! ভালোবাসা না আসলে ভালোবাসা জোর করে আনতে হবে!

চা হাতে দাঁড়িয়েছি এক জায়গায়। কিছুদূর সামনে এক মেয়ে এসে দাঁড়াল। আপাদমস্তক বোরখা আর হিজাব পরা একটা মেয়ে, স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি নিশ্চয়। আশেপাশে বেশ কয়েকটা কোচিং সেন্টার, এর কোনো একটা থেকে বের হয়েছে হয়তো। হঠাৎ সামনে একটা সিএনজি এসে থামল, ভেতরে এক ছেলে, মেয়েটা ডানে বায়ে তাকিয়ে সিএনজিতে উঠে পড়ল। এই সিএনজি এদিক সেদিন ঘুরবে কিছুক্ষণ কিংবা অনেক্ষণ, তারা এই সময়টাতে নর্দন কুর্দন করবে, তারপর একসময় মেয়েটার বাসার আশেপাশে কোথাও সিএনজিটা গিয়ে থামবে, আবারও সাবধানে ডানে বায়ে তাকিয়ে মেয়েটা নেমে যাবে। যেন কিছুই হয়নি এরকম একটা ভাব নিয়ে মেয়েটা ঘরে ফিরবে, রোজ এভাবেই ফেরে। খুবই সহজ সরল গল্পের স্ক্রিপ্ট।

মেয়ের বাবা মা নিশ্চয় সবাইকে বলে বেড়ায় "জানেন, আমার মেয়ে কিন্তু আর দশজনের মত না"। যে ছেলেগুলো খদ্দের সেজে এভাবে সিনএনজিতে মেয়ে তোলে, এরকম অনেক খদ্দের ছেলেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি, পাঁচ ছয় বছরের ভার্সিটি লাইফে এই ছেলেগুলোকে দেখেছি "আর দশজনের মতো না" মেয়েগুলোর সাথে সেই সিএনজিতে কী কী করে এসেছে তার কুৎসিত বর্ণনা বন্ধুদের রসিয়ে রসিয়ে বলতে।

কী বুঝে আসলে?? স্কুল ড্রেস পরে মামাতো/খালাতো/ফুফাতো কিংবা হাউজ টিউটর না হয় বন্ধুদের কারো সাথে বাবা মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রেম প্রেম খেলা করে বেড়ানো মেয়েটা আসলে কি বোঝে? হঠাৎ করে দেখা কোন মেয়েকে পটিয়ে গার্লফ্রেন্ড

বানানোর পেছনে অকালপক্ব প্রতিভার সবটুকু খরচ করা, রাতের পর রাত জেগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে কথা বলা আর অর্ধেক মাসেই বাড়ীতে মাস খরচের টাকা চাওয়া ছেলেটার কাছে ভালোবাসা আসলে কি?

চারপাশের এই ছেলেমেয়েগুলো আসলে চলে **ভাড়া করা মগজ দিয়ে**। হিন্দি সিরিয়ালের পরকিয়া প্রেম দেখে এরা প্রেম করতে শেখে, 'আমি তুমি-তুমি আমি' গান কবিতায় এরা আবেগের রসদ খোঁজে। গল্প উপন্যাস পড়ে নিজেদেরকে নায়ক নায়িকার আসনে বসিয়ে 'কল্পনা' আর 'বাস্তবতা' গুলিয়ে জীবনে রং লাগায়। সেলুলয়েডের রঙিন পর্দায় নায়ক নায়িকাদের চিত্রনাট্যের আবেগি উপস্থাপন দেখে প্রেমের স্বরূপ বোঝে! ইমরান হাশমি-মল্লিকাদের অর্ধনগ্ন শরীরের ভাষা থেকে সহজলভ্য পর্ণগ্রাফিতে জৈবিকতার আদিম রীতিতে এরা 'ভালোবাসা'টাকে 'শরীর' দিয়ে replace করে।

এরা বোঝে শরীর শরীর খেলায় বিদ্যুৎ চমকের মত হঠাৎ হঠাৎ পাওয়া ফ্যান্টাসিটুকুই ভালোবাসা! তাদের কাছে তাই ভালোবাসা মানে প্লেটোর ভাষায়, "love is a serious mental disease!!" Wrong! সিরিয়াসলি it's wrong! এই ধরণের ভাড়া করা মগজপ্রসুত ভালোবাসা কোন অন্তরের রোগ নয়, **এটা প্রবৃত্তিপূজা**। স্রেফ desire. ভালোবাসা মানে যদি অন্তরের সবকিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়া, বিধ্বস্ত হওয়া, কোন কাজে মন বসাতে না পারা, জীবনের সবকিছু উৎসর্গ করা বোঝায় তাহলে সেটা ভালোবাসা নয়। আমরা এসবকে ভালোবাসা মনে করলেও আল্লাহ্‌পবিত্র কোরআনে এটাকে hawa বলেছেন। আর যারা এই desire কে অন্ধভাবে পূজা করে তাদেরকেই আল্লাহ্‌বলেন,

"অতঃপর তারা যদি তোমার কোথায় সাড়া না দেয় তাহলে জেনে রেখ, **তারা শুধু তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে**। আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ ছাড়া যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ

করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে? আল্লাহ্‌জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।" [২৮:৫০]

আমাদের প্রবৃত্তিকে মহান আল্লাহ্‌র কাছে সঁপে দেওয়ার বদলে আমরা সেই প্রবৃত্তিরই পূজা করি আর স্রষ্টার দেওয়া রহমতের একটা মাধ্যমকে পূজা করে সেখানেই রব খুঁজি! আল্লাহ্ বলেন,

"আর কোন কোন লোক এমনও আছে, যে আল্লাহ্‌ছাড়া অন্যান্যকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষরুপে গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার মত তাদের ভালোবাসে। কিন্তু যারা মুমিন, আল্লাহ্‌র সাথে তাদের ভালোবাসা প্রগাঢ় এবং কি উত্তমই হত যদি এ যালিমরা শাস্তি দেখার পর যেমন বুঝবে তা যদি এখনই বুঝত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহ্‌শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।" [২:১৬৫]

কারো প্রতি ভালোবাসা যদি হয় পরিবারকে ছেড়ে যাওয়া, ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া নিজেদের সম্মান, আত্মমর্যাদা, আমাদের শরীর, আমাদের দ্বীন এমনকি ত্যাগ করা সেই মহান আল্লাহ্‌কেও যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন শুন্য থেকে তাহলে we are not in 'love'. We are slaves to that 'love'. আল্লাহ্‌বলেন— "তুমি কি লক্ষ্য করেছ তার প্রতি যে **তার খেয়াল খুশিকে** ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে?" [৪৫:২৩]

ভালোবাসার মরীচিকার আবরণে আমাদের এই কুপ্রবৃত্তির সাময়িক আনন্দ প্রকৃতপক্ষে যথার্থ স্বাধীনতা নয়___বন্দীশালা! এই বন্দিত্ব মনের, শরীরের আর আত্মার!

একটা সহজ বিষয় একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় খেয়াল করি। মনে করুন আমি কোথাও যাচ্ছি। যাওয়ার আগে আপনার হেফাজতে আমার একটি মূল্যবান জিনিস রেখে যাচ্ছি যার বিষয়ে আপনি কিছুই জানেন না। আমার জিনিসটার safety হিসেবে আমি কি

আপনাকে কিছু direction দিয়ে যাবনা? এটা এমন করোনা, অমন করোনা ইত্যাদি ইত্যাদি...!

তাই নয় কি? আর এই যে আপনার মনে ভাল লাগা-মন্দ লাগার অনুভূতি আছে, আপনি কাউকে পছন্দ কিংবা অপছন্দ করতে পারেন। এই অসাধারণ রহমত আল্লাহ্আপনাকে দিলেন তা কোন rules and regulations ছাড়াই?? কোন security ছাড়াই? Rules and regulations ছাড়া আপনি একটা চার চাকার গাড়ী চালাতে পারেন না, একটা ছোট্ট মোবাইল চালাতে পারেন না.....কিছুই করতে পারেন না আর যে মনটার খবর মহান আল্লাহ্ছাড়া আর কেউ জানেনা সেই মনের ভালোবাসা ধরে রাখার জন্য rules and regulations কি তিনি দেবেন না? এই ভালোবাসার কোন security কি নেই?

"আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের (মানব জাতির) মধ্য থেকেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য (বিপরীত লিঙ্গের) জুড়ি, যাতে করে তোমরা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো! এ উদ্দেশ্যে তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন হৃদ্যতা- বন্ধুতা আর দয়া- অনুগ্রহ অনুকম্পা। এতে রয়েছে বিপুল নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্য" [৩০:২১]

সুবহানাল্লাহ! এখানে boyfriend/girlfriend এর কথা নেই, 'তোমাকে ছাড়া বাঁচব না, মরে যাব' 'তুমি জীবন তুমি মরণ' অসার বাক্যে বিলিয়ে দেওয়া ভালোবাসার অপচয় নেই, শরীর ভোগের চাটুকারিতা নেই_আছে নিরাপত্তা, প্রশান্তি আর পবিত্রতা! যে ভালোবাসা মহান আল্লাহ্দিয়েছেন তিনিই ভালো জানেন কিভাবে এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। আমরা আমাদের মনটাকে purify করব। আমাদের ভালোবাসাকে নির্ধারণ করব শুধুমাত্র আল্লাহ্র দিকে। আর গ্রহণ করব তার অনুমোদিত সিস্টেমটাকে যাতে আমাদের কাছে গচ্ছিত রাখা তার আমানত হেফাজতে থাকে। **আমরা আল্লাহ্র সিদ্ধান্তে আস্থা রাখব, আমাদের কুপ্রবৃত্তির উপর নয়**!

অফিসে যার অধীনে চাকরী করি আমরা তার কথা শুনতে বাধ্য, তাকে সন্তুষ্ট করাই থাকে মূল লক্ষ্য। তার অধীনে থাকা অন্য কারো কথা শুনলে ফায়দা কিছু নেই। ঠিক তেমনি আমাদের প্রতিটি ভালোলাগা, মন্দলাগা, আবেগ অনুভূতির কেন্দ্র যেন হয় মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। তিনি তার সন্তুষ্টি অর্জনের যে মাধ্যমগুলো দিয়েছেন সেই মাধ্যমকে ভালোবেসে দুনিয়ায় হয়ত কিছু সময়য়ের সস্তা আবেগের মাখামাখি সম্ভব **কিন্তু আত্মার কোন সন্তুষ্টি এতে নেই**। দোকানে সিডি কিনতে গেলে আমরা সিলভার ডিস্ক এর সন্ধান করি প্রিন্ট যেন ভালো হয়। সেই একই ছবি অতি সস্তা পাইরেটেড সিডি কিনে দেখা যায় কিন্তু তাতে সন্তুষ্টি থাকে না।

মহান আল্লাহ্‌কে এবং তার জন্য কাউকে ভালোবেসেই আমরা পাব যথার্থ সন্তুষ্টি। আর নোংরা সমাজের এই নাটুকেপনা আবেগ, সস্তা লোকদেখানো মেকি সুখ সুখ ভাবের প্রেম, নারী পুরুষের শরীর ভোগের এই জগন্য 'বিশ্বাসযোগ্যতা' ফুটপাতের পাইরেটেড সিডির মত! চাকচিক্য দেখে মনে হবে 'পাইলাম ইহাকে পাইলাম', কিন্তু মোড়ক খুললেই বেরিয়ে আসে ঝাপসা-বিবর্ণ জীবনের এক সস্তা চিত্রনাট্য। আর তাই ভালোবাসা হবে আল্লাহ্‌র জন্য, নফস এর জন্য নয়। তাকেই ভালবাসব যাকে মহান আল্লাহ্‌ভালবাসেন, তাকে ভালবাসবো না যাকে আল্লাহও ভালোবাসে না!

আল্লাহর জন্য যে ভালোবাসার সুত্রপাত হয় সেই ভালোবাসা নিজের স্বার্থে কখনো অগ্রাহ্য করা যায়না! আমাদের মা রা কেন আমাদের এতোটা ভালোবাসে?? কেন অপরিচিত দুইজন নারীপুরুষ হঠাৎ একদিন বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একে অপরকে এতো বেশী ভালবাসতে পারে?? কারণ এই সম্পর্কগুলোতে আল্লাহ প্রদত্ত রহমত থাকে! ঠিক সেভাবেই একজন মানুষ যখন আরেকজন মানুষকে **আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে** (অবশ্য এই ছেলেমেয়েগুলো কি জানে, আল্লাহ্‌র জন্য কাউকে ভালোবাসতে হয় কিভাবে?), তখন সেই ভালোবাসার সবটুকু জুড়ে থাকে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আন্তরিকতা, সহমর্মিতা! শুধুমাত্র এই কারনেই একজন

বয়ফ্রেন্ড আর গার্লফ্রেন্ড যতো সহজে "break up" শেষে "new relationship" শুরু করতে পারে। একজন স্বামী তাঁর স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রী তাঁর স্বামীকে অত সহজে জীবন থেকে বাদ দিতে পারেনা, যেভাবে পারেনা মা তাঁর সন্তানকে ছাড়তে!! শুধুমাত্র এই কারণে একজোড়া কপোত কপোতী যতো সহজে অন্ধকার ঝোপ-ঝাড় কিংবা রিকাশা সি-এন-জির সুযোগ নেয় একজন স্বামী আর স্ত্রীর কাছে তা এতো সহজ নয়! কারণ একজন স্বামী জানে তাঁর স্ত্রীর সম্মান তারও সম্মান যেভাবে একজন স্ত্রী জানে তাঁর স্বামীর ভালোবাসা শুধুই তাঁর, এটা রাস্তা ঘাঁটে দেখানোর বিষয় নয়!!

ছেলেদের দিকে তাকালেই বুঝা যায়, বয়ফ্রেন্ডর কাছে তাঁর গার্লফ্রেন্ড যেন দোকান থেকে কেনা আইসক্রিম! সে জানে আইসক্রিমটা তাঁর কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্য একটু পরেই সেটা পানি হয়ে যাবে!! আর তাই একজন বয়ফ্রেন্ডের মনে তাঁর গার্লফ্রেন্ডের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আন্তরিকতা, সহমর্মিতার চেয়ে বেশী থাকে শরীরকেন্দ্রিক ভোগবাদী ক্ষণস্থায়ী আবেগ যেটা কঠিন বরফ থেকে খুব সহজেই পানি হয়ে যায় দোকান থেকে সদ্য কেনা আইসক্রিমটার মত!! সুবহানাল্লাহ! ইসলাম মানুষকে সেই সম্পর্করেই অনুমতি দিয়েছে যেখানে একে অন্যের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা থাকবে, সহানুভূতি থাকবে, শ্রদ্ধাবোধ থাকবে আর থাকবে একে অন্যের সাথে সুখ-দুঃখ গুলো একেবারে নিজেদের মত করে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ!! আর তাই একজন মুসলিমের কাছে বিয়ে মানেই একটা বউ আর কয়েকটা বাচ্চা-কাচ্চা নয়!

বিয়ে মানে অনেক কিছু.....অনেক কিছুর মাঝে ঠিক কয়েকটা লাইনে বোঝানো যায়না এমন কিছু হয়তো!!

আর কয়দিন পর বিশ্ব ভালোবাসা দিবস নামের এক গাঁজাখুরি দিবস আমাদের সবার কাছে ভালোবাসা বিসর্জনের উপলক্ষ্য হয়ে আসবে প্রতি বছরের মতই। আধুনিক শরীরে বিকৃত মস্তিষ্ক নিয়ে গর্বের সাথে বেড়ে উঠা আমাদের তরুণ তরুণী প্রস্তুত এই

দিনটির জন্য। কিছু অতি উৎসাহী কিংবা চালাক পুরুষ তৈরি নিজেদের পরিকল্পনা নিয়ে। কিছু বোকা নারী প্রস্তুত ভালোবাসার মোড়কে ব্যবহৃত হতে। সারা পৃথিবী জুড়েই এদিন নষ্টামির চূড়ান্ত হবে। ভালোবাসা দিবসের নামে এই ভোগ দিবসে আমাদের অনেক বোনই জীবনের অনেককিছু হারিয়ে নোংরা সমাজ থেকে বুঝতে শিখবে 'this is love'. ধর্ষকদের বৃহস্পতি যখন তুঙ্গে তখন এই দিনে ধর্ষণও পাবে এক নতুন মাত্রা! লাল নীল রঙিন স্বপ্ন, টকটকে লাল গোলাপ, হাজারো মিথ্যে প্রতিশ্রুতি-অঙ্গীকার সাথে স্বপ্ন ভাঙ্গার অশ্লীল আনন্দ সবকিছু ছাপিয়ে শুন্য জীবনের আধ্যাত্মিক পরাজয়ে এই মানুষগুলো কোনদিনও জানতে পারবেনা ভালোবাসা আসলেই কি!!

'ভালোবাসা' কে 'শরীর' দিয়ে relpace করা মানুষগুলোর জন্য প্রথম আলোর মত স্বীকৃত প্লাটফর্মও আছে। অমুককে ভালবাসতাম... কথা হল..... দেখা হল..... ফিজিক্যাল রিলেশন হল..... ব্রেক আপ হল..... এখন আমি কি করব?? এই ধরণের চটি প্রশ্নগুলো মানুষ যতটা গর্বের সাথে করে ততটা গর্বের সাথেই উত্তর আসে এই চটি গল্পগুলোকে সাহস যোগানো আমাদের অপদার্থ সুশীলদের কাছ থেকে। এ যেন আর্টসেলের গানের মতই "তোমরা কেউ কি দিতে পার প্রেমিকার ভালোবাসা" দিয়ে শুরু, মাঝখানে "দেবে কি জীবনে কেউ উষ্ণতার সত্য আশা", আর শেষমেশ "ও আমায় বোঝে নি, অতল এ ভালোবাসা সে তলিয়ে দেখে নি", সান্ত্বনায় আবার "তোমরা কেউ কি দিতে পার প্রেমিকার ভালোবাসা".....!! অন্ধ ভালোবাসার পূজারী মানুষগুলোর কাছে ছবির ডায়লগের মতই "ভালোবাসা জাত ধর্ম বর্ণের উর্ধে" যেন এক মুখস্থ ছবক!

প্রথম আলোর নকশায় (১ জানুয়ারি ২০১৩) এক মেয়ে অন্য ধর্মের এক ছেলের সাথে প্রেমে পড়েছে। সে বলছে ধর্ম পরিবার ত্যাগ করে তারা একে অপরকে বিয়ে করতে পারবে না। তার প্রশ্নের একটা অংশ হুবুহু দিচ্ছি, "সে বলে ভবিশ্যতের কথা ভেবে

আমি যেন বর্তমান সম্পর্কের এই সুন্দর সময়টা নষ্ট না করি। সে চায় আমি অন্য কাউকে বিয়ে করার আগ পর্যন্ত তার সাথে সম্পর্ক রাখি।" আর এতে জনাবা সারা যাকের কি সুন্দর সাহস দিলেন, "যত দিন চলছে চলুক এই মনোভাব নিয়ে চললে ক্ষতি বৈ লাভ কিছু হবেনা। তুমি নিজে বিবেচনা করে দেখ তুমি কোনদিকে যেতে চাও। অনেক ক্ষেত্রে গভীর ভালোবাসা যেকোনো বাধা অতিক্রমও করতে পারে। বিষয়টা ভেবে দেখ।" এই মাথামোটা মেয়েগুলা "গভীর ভালোবাসা যেকোনো বাধা অতিক্রমও করতে পারে" আশ্বাসে নিজদের ভালোবাসার গভীরতা যাচাই করতে ঘর ছেড়ে পালাবে না তো কি করবে??? আমরা কবে বুঝব এসব ভালোবাসা নয়_desire! ভয়ংকর desire! কত গর্বের সাথে আমরা ভালোবাসার মোড়কে নোংরা গল্পগুলো বলে বেড়াই। কত নির্লজ্জভাবে boyfriend/girlfriend এর সাথে নিত্যদিনের লীলা গল্প সবাইকে জানিয়ে বেড়াই।

আমি জানি এই ছেলেমেয়েগুলো একদিন ঠিকই অন্য কারো সাথে কবুল বলে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। ফেসবুকে 'in a relationship' দিয়ে যার বাহুডোরে সুখ সুখ ভাব নিয়ে প্রফাইল পিক আপলোড হয় একদিন এই প্রফাইল পিকে হয়তো সন্তান কোলে ছবি থাকবে__শুধু বাবা ভিন্ন!! দুইজনের হাসিমুখের ছবি বাসর ঘরের ছবির ফ্রেমে টাঙ্গানো হবে। কিন্তু এই মেয়েটি কি তার পাশের মানুষটিকে কোনদিন বলতে পারবে__**আমি পবিত্র, আমি শুধু তোমার জন্য পবিত্র ছিলাম**! কোনদিনও কি বলতে পারবে জীবনে কারো গোলাপ আমি হাতে নেইনি, কারো হাতে হাত রেখে আমি ভালোবাসা ভালোবাসা খেলা খেলিনি, আমি শুধু আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছি একজন ভালো মানুষের হাতে হাত রাখার জন্য। এই ছেলেটি কি কোনদিনও বলতে পারবে__**আমি আমার চোখকে সংযত করেছি শুধু তোমার জন্য**! কোনদিনও কি বলতে পারবে? কোনদিনও পারবে না! কোনদিনও পারবে না বলে এরা জানতেও পারবে না ভালোবাসা আসলে কি!! পারবেনা বলে প্রবৃত্তিপূজা ছাপিয়ে এরা কোনদিন আল্লাহ্‌র

জন্য ভালবাসতে পারবেনা। ভালোবাসার নামে "অসহ্য যন্ত্রণার কিট" নিয়ে এরা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ভান করে যাবে।

একদিন রাতে ক্যাম্পাসে একা একা হাঁটছিলাম। হঠাৎ এক ছেলে পেছনে মোবাইল ফোনে চিৎকার করে অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করল। সে তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে ব্রেক আপটা তাহলে করেই ফেলছে। সেই চিৎকার করে রাস্তার মানুষের সামনে বলা কথাগুলোর একটা শব্দও এখানে লিখতে পারলাম না। কিছুদিন আগেই হয়তো কুসুম কুসুম প্রেমের শেখানো বুলি দিয়ে এরা রঙিন রঙিন ভালোবাসার গল্প শুরু করেছিল । অর্থহীন সেই আবেগের কি বীভৎস সমাপ্তি আরেকটি রঙিন গল্প শুরুর আগে! আমাদের হিজাবি, দাঁড়ি- টুপির দ্বীনী ভাইবোনদের শয়তানি হিকমার 'দ্বীনী রিলেশন' এর কথা বলে মনটা খারাপ করতে চাইনা আর লেখাটাও দীর্ঘ করতে চাইনা।

আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে যেখানে নারীদেরকে জন জন করে তাদের **মাহরাম** কারা তা বলে **নন মাহরাম** থেকে বিরত থাকতে বলেছেন সেখানে দ্বীনী লেভেলের শয়তানগুলোর কাছে পিরিতির বাকবাকুম "ওহ! এ কিছু না!" অনেকের কাছেই আবার অতি কমন শয়তানি সান্ত্বনা__আরে বিয়ে তো করবই! যেন "বিয়ে তো করবই" এটা সবকিছু হালাল করার সার্টিফিকেট! আমাদের কাছে বিয়েটা যেন সবকিছুর একটা ফুলস্টপ! গল্প শেষ.....সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে লাগিল! তারপর আবার গল্প শুরু হবে জান্নাতের হুর দিয়ে! **এত সহজ??** বরং বিয়ে দিয়েই প্রত্যেকের পরীক্ষা শুরু আসলেই ভালোবাসাটা আল্লাহ্র জন্য কিনা! ঈমানের পরীক্ষা এখান থেকেই শুরু। আবার অনেকে মনে করে যা কিছু করার করে নিই তারপর আল্লাহ্র কাছে তাওবা করে বিয়ে করে ফেলব! অথচ এরা যে তাওবার অর্থটাই বোঝে নি। ইসলামটা একটা সিস্টেম। One way road, এই সিস্টেমে হারাম দিয়ে enter করে হালাল দিয়ে exit করা যায়না। অবৈধ প্রেমের হারাম enter করে যারা হারামটাকে হালাল বানিয়ে এই সিস্টেম থেকে exit করতে চেয়েছে চারপাশে তাদের

জীবনের গল্পগুলো পড়ে দেখুন! এই হারাম আপনাদের জীবন থেকে আপনাদের সন্তান হয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ছড়িয়ে যাবে। বিষ নির্মূল করতে না পারলে তা পুরো শরীরকেই বিষিয়ে তোলে! ভালোবাসার জন্য যারা ভালবেসেছিল, যারা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র জন্যই ভালবেসেছিলেন। পেয়ছিলেন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, আমরা তাদের কাছেই ভালোবাসা শিখব, সমাজের এই নোংরামি থেকে নয়।

ভালোবাসা__যখন হযরত খাদিজা (রাঃ) সমস্ত সম্পত্তি দ্বীনের পথে কুরবান করেছিলেন যে মানুষটিকে তিনি ভালবেসেছিলেন তার হাতে!

ভালোবাসা___যখন রাসুল (সাঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ) এর পান করা পানির গ্লাস তোলে নিয়ে তার চুমুক দেওয়া জায়গাতেই চুমুক দিয়েছেন।

ভালবাসা__যখন হযরত আয়িশা (রাঃ) কে দৌড় প্রতিযোগিতায় হারিয়ে তার সাথে কৌতুক করেছিলেন।

ভালোবাসা__যখন কেউ শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্কে ভালোবেসে আধুনিকা গার্লফ্রেন্ড / বয়ফ্রেন্ড / হারাম সম্পর্ক ডাস্টবিনে ছুড়ে মারতে পারে।

ভালোবাসা__যখন প্রিয় স্ত্রীকে রেখে রহমতের বান্দা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যায় আর প্রতিশ্রুতি দেয় জান্নাতে তার জন্য অপেক্ষা করবে।

ভালোবাসা__রাতের আঁধারে ক্রন্দনরত যুবকের চোখের পানিতে মহান আল্লাহ্র কাছে একজন সচ্চরিত্রের সঙ্গিনীর প্রার্থনা!

এই ভালোবাসা কি কেউ কখনো অনুভব করেছে? কখনো মেপে দেখছে কত ওজন এই ভালোবাসার??

এটা মাপা যায়না__অনুভব করা যায়। এই ভালোবাসায় কোন ব্যক্তিস্বার্থ নেই, কোন ঘৃণা নেই। ভালবাসা আর ঘৃণা দুইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়! কিন্তু দুইটার মাঝে কেমন একটা মিল খুঁজে পেলাম! আপনি যা সত্যিকার অর্থে ভালবাসেন তা কখনোই ঘৃণা করতে পারবেন না! আর সত্যিকার অর্থে ঘৃণা করা কাউকে পারবেননা ভালবাসতে!
তুমি জীবন, তুমি মরণ, স্বপনে তুমি, জাগরণে তুমি টাইপ কথায় ভালবাসার স্বরূপ বুঝতে চাওয়া বোকামি! আমি-তুমি টাইপ কবিতা আর কিছু লাভ-মেসেজ ভালবাসা হলে কেউ তার প্রিয় মানুষটাকে না পাওয়ার ভয়ে জবাই করতে পারত না, পারত না ২৬ টুকরা করে রক্তের হোলি খেলতে! এসবে ভালবাসা নামক মানুষের অনেক গভীরের বিষয়টা থাকে না! থাকে সমাজ থেকে জোর করে মাথায় নেওয়া মনুষ্যত্ব বিসর্জনের কিছু জঘন্য মাদকতা! প্রিয় মানুষটার কোন দোষত্রুটি কিংবা দুর্বল কোন বিষয়কে আয়না করে তার সামনে দাঁড়িয়ে দেখুনতো!! এখনো কি ভালবাসেন তাকে?? নাকি অন্তরে ঘৃণা জমছে??

যদি ছোট্ট কোন দুর্বলতার জন্য প্রিয় মানুষটার প্রতি ঘৃণা আনতে পারেন তাহলে আপনি তাকে কখনোই ভালবাসতে পারেন নি! ভালবাসা সবসময় পাশে থাকা! ভুলকে মেনে তা শোধরানোর চেষ্টা করা! দিকভ্রান্ত পথ থেকে সঠিক পথের মশাল দেখিয়ে বলা – সখি হাতটা ধর...একসাথে জান্নাতের পথে হাঁটি!!

শেষকথাঃ ভাবালুতা আর নোংরামিতে মিশে যাওয়া আমার মুসলিম ভাই বোনেরা ভুলে গেছে এখানেও ইসলামের say আছে। কিন্তু আমি জানি যাদের উদ্দেশ্য করে এই লেখাটা লেখা তারা কেউ এটা পড়বে না। যে কয়জন সমমনা বন্ধু এটা পড়বে তাদের না পড়লেও হয়। তারপরও ছোট্ট আশা যাদের জন্য এই লেখা তাদের কেউ একজন একদিন.....কোন একদিন এই লেখাটা পড়ে দেখবে। হঠাৎ করে হয়তো নিজের মিথ্যে ভালবাসাটাকে purify করার তাড়না পাবে। অনেক অনেক পরের প্রজন্মের কেউ

একজন এই সমাজের নোংরামিতে ভালোবাসা খোঁজার আগে আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসতে শিখবে।

এরকম হলে এই লেখাটা সেই কয়েকজনের জন্য থাক। তারপরও অনেকের কাছেই এই লেখা হাস্যকর মনে হবে। আমাকে ছাগু ছাগু মনে হবে। তাদের জন্য দোয়া থাকল আল্লাহ্‌যেন সবাইকে হেদায়াত দেন। কিন্তু মনে রাখিস.....একদিন এই অবুঝের কথাগুলো জীবনের পাতায় পাতায় মিলিয়ে দেখিস। যেদিন ভালোবাসাহীন জীবনে নিজেকে দেওয়ার মতও এতটুকু ভালোবসা থাকবে না, যেদিন অন্তরাত্মা শুকিয়ে কঙ্গালসার শরীরে নিজেরই ঘৃণা জমবে সেদিন এই অবুঝের কথাগুলো মিলিয়ে দেখিস! ভালোবাসার মোড়কে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আত্মসম্মানের শেষ বিন্দুটুকুও বিসর্জন দিয়ে **সিলিং ফ্যানে ঝুলে পড়ার আগে এই অবুঝের কথাগুলো বুঝে নিস**! জীবনের ওপারে আল্লাহ্‌র জন্য কারো ভালোবাসা যদি পেতে চাস তবে এপারে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসতে শিখিস!

মনে রাখিস ধুঁকে ধুঁকে ক্ষয়ে যাওয়া তোর জীবনে আর কেউ না থাকুক অসীম রহমতের আঁধার মহান আল্লাহ্‌তোকে কোনদিনও নিরাশ করবেনা। অনেক অনেক দোয়া থাকল সবার জন্য।

ভালোবাসা সবার ঘরে বৃষ্টি হয়ে নেমে আসুক.....

আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ কোন সে বাঁধনে

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে আমাদের প্রজন্ম। আমাদের সময়, আমাদের পরিবার, আমাদের বন্ধন আর আমাদের চারপাশ! তথ্য প্রযুক্তিতে থ্রি-জি, ফোর-জি এর জেনারেশন বদলের চাইতেও দ্রুত বদলে যাচ্ছে আমাদের জেনারেশন, তার "ইন্টারনাল টেকনোলজি" আর ইভোলিউশন হচ্ছে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে।

আগে একটা সময়ে আমাদের প্রজন্মের আব্বা-আম্মারা তাদের মধ্যে কথাবার্তা 'মেলামেশা' ছাড়াই বিয়ে-শাদী করেছিলেন। সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। আমাদের দেখলে গলার কণ্ঠ নামিয়ে তর্ক-ঝগড়া করতেন। কথায় কথায় মায়েরা বাপের বাড়ি 'যাও', 'যাবো' বলতে পারতেন না, বলতেন না... একাট্টা হয়ে দু'জনে মিলে যুদ্ধ করে সংসার নামের নৌকাটার হাল ধরতেন সংসার জীবনের চরম দুর্দিনেও... পারস্পরিক সম্মান, অগাধ বিশ্বাস আর দু'জনের মিলিত "কমিটমেন্টের" মাধ্যমে তারা পাড়ি দিয়েছেন বিশাল পথ। ভালোবাসা শব্দটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে দেখিইনা আমরা তাদেরকে!

অথচ আজ আমরা বিয়ের আগে 'দেখাদেখি' 'মিলামিলি' আর 'মিশামিশি' ছাড়া কল্পনাই করতে পারিনা বিয়েশাদী। আধুনিকা মেয়েরা অচেনা ছেলেদের সাথে বিয়ে করাকে "শুয়ে পড়া" বলে 'ডিনোট' করতে পছন্দ করেন। এক বান্ধবীকে ক্লাসরুমে বিয়ে নিয়ে বলতে শুনেছিলাম -- "আব্বা-আম্মার পছন্দের ছেলেটার সাথে ধুম করে শুয়ে পড়তে পারবো না।" আর নিজ শব্দটা, ভাবের প্রকাশটা ধাক্কার মত লেগেছিলো আমার। বাবা-মা পছন্দ করতে গেলেই সেটাতে "শুয়ে পড়া" প্রধান হয়। অথচ নিজেদের পছন্দ কেবল সমাজের নিত্য-নতুন অবিন্যস্ততা বা কঠিন ভাষায় অরাজকতাই এনে দিচ্ছে।

আধুনিক আমাদের পোলাপানরা ফেসবুকে দিনে রাতে স্ট্যাটাস বদলে "সিঙ্গেল" থেকে "ইন আ রিলেশনশিপ" আর "ইটস কম্পলিকেটেড" বানায়.....সম্পর্কগুলো কতনা সস্তা হয়ে যাচ্ছে!

আমাদের মায়েরা "ক্ষ্যাত" ছিলো! সারাজীবন আমাদের কোলেপিঠে মানুষ করত, মাথার চুলটা আঁচড়ানোর সময় থুতনি সমেত গাল দুইটা ধরত, স্কুলের টিফিনটা বেঁধে দিতো নইলে পানির বোতলটা ভরে দিতো। তাদের বান্ধবীদের সাথে হিন্দি সিরিয়ালের আলাপ জুড়তো না ঘন্টার পর ঘন্টা। সময় বদলে এখন কাজের মেয়ে 'আনিসা'রা আমাদেরকে স্কুলে পাঠায়। আম্মু সকালে অফিসে যাবার আগে খালি বলে যান--"সুমন, খাবারটা খেয়ে নিয়ো, বাসায় ফিরে পড়াশোনা করিও... "। সুমনরা বাসায় ফিরে নেটে চ্যাট করে, লাল সাইটগুলোতে বসে চোখ লাগায়, মোবাইল কানে ধরে বিছানায় গড়াগড়ি খায়। এভাবেই বেড়ে উঠতে থাকে আগামী যুগের কর্ণধারেরা...

আমরা তিন চারটা গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড না থাকলে 'স্মার্ট' হইনা। বিএফসি আর কেএফসি তে না খেলে 'ইশমার্ট' হইনা। একবার আমাদের এক বন্ধুকে অপর বন্ধু 'টেক্সমার্ট' না চেনার অপরাধে তাচ্ছিল্য করেছিলো -- সেই ভাষাটা ভুলে যাবার মতন ছিলো না। আমাদের সময়ের টিভির মডেল আপুদের দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হই। জীবনে 'মুক্ত' হইতে পছন্দ করি। "কেমন ছেলে পছন্দ?" এই ধরণের প্রশ্নের উত্তরে শোনা যায়-- "কেয়ারিং শেয়ারিং..... ইত্যাদি ইত্যাদি"-- যার গূঢ়তম অর্থ কী -- বক্তার দল কোনদিনও ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। কারণ তারা জানেনই না! তারা জানেন এগুলো কিছু বাক্য যেগুলো স্মার্ট হলে বলতে হয়--ভাবতে হয়। তার জাগতিক অবস্থান আছে কিনা সেগুলো চিন্তার অধিক ব্যাপার-স্যাপার।

"আমি একটু 'স্বাধীনচেতা'" মর্মে আমাদের নব্য আধুনিকা আপুরা ঘোষণা দেন। অথচ তারা জানেনই না এইটার মানে কি! স্বাধীন হতে হতে অদ্ভূত একটা পরাধীনতার

শিকলে আটকা পড়ছেন সেটা টের পাচ্ছেন না। নিজেকে "আকর্ষণীয়" করে উপস্থাপন না করলে, 'খুল' আর 'হট' না হলে পুরুষদের কাছে তারা 'ইভ্যালুয়েটেড' হবেন না বলে পার্লারের সাথে, ফেসিয়াল, আই-ব্রো প্লাক, চুল স্ট্রেইটিং, মেনিকিউর, পেডিকিউর এর সাথে আজীবন বন্ধন করে ফেলছেন। অথচ এই ভরা সৌন্দর্য আর সহজাত যৌবন চলে যাবার পর তারা কী দিয়ে "পুরুষ"দের "বেঁধে" রাখবেন -- সেই চিন্তাটা মোটেই ভাবেননি তারা -- হলফ করে বলা যায়। এই "বাঁধন" খুবই অবিবেচক, খুবই দুর্বল বাঁধন রে বোন -- এভাবে হয়না! অর্জন করতে না পারো, নিজেকে লেলিয়ে দিয়ে পাশবিক অনুভূতির পুরুষ দ্বারা নিজেদের ক্ষতিসাধন করিও না! সেদিন একটা ফিচারে পড়ছিলাম -- পশ্চিমা বিশ্বে নাকি ৫০ শতাংশ ছেলেপিলে তাদের বাবার পরিচয় জানে না! তথ্যের অথেনটিকেশন জানিনা, তবে ঘটনা যেমন জানি সেই হিসেবে নামলে অবস্থা এর চাইতে খারাপ হবে বলেই আমার বিশ্বাস। আমাদের গন্তব্য কি অমনই কোন ঠিকানায়?

এই জগতের কোন নারী কোনদিন অস্বীকার করতে পারবে না যে তারা একটা পুরুষের জন্য মনের অনেক অনেক স্বপ্ন সযত্নে সাজিয়ে রাখেন। সেই মানুষটা এসে তার প্রতি আন্তরিক হবে, কথা শুনবে আর একসাথে বন্ধু হয়ে জীবনটা কাটাবে-- বেশিরভাগই এমন চিন্তা করেন। যেইসব 'ছেলেদের' সাথে আপুরা এখন সন্ধ্যাতে, গোধূলিবেলায় ঘুরে বেড়ান-- তারা তাদের 'স্বপ্নপূরণে' সচেষ্ট হউক-- প্রার্থনা করি। আহারে, তাও যদি হতো!! শরীরের যাবতীয় "পাপ" নাকি ঝেড়ে ফেলা যায়। একটা সময় প্রচলিত ছিলো মেয়েরা কেবল "ভুক্তভোগী"। একজন শিক্ষিত তরুণীকে বলতে শুনেছিলাম -- ছেলেরা "ঝেড়ে" ফেলতে পারলে মেয়েরাও পারে, এইটা ব্যাপার না! আমি মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম -- "যদি পারতা"! নিজেদের অজান্তে নিজেদের প্রশ্রয় দিয়ে, ছেলেদের প্রশ্রয় দিয়ে অনিশ্চিত জটিল একটা ভবিষ্যতের আঞ্জাম দিচ্ছো বোন -- সে যদি অনুভব করতে পারতে!

আন্ডারগ্র্যাডে পড়ার সময় এক বান্ধবী বলছিলো বন্ধুদের-- "মেয়েরা এখন ছেলেদের ক্ষতির ভয় পায়না, বুঝসিস?" আমি টাশকি খেয়ে তখন প্রভাপু, চৈতিপু এবং অন্যান্য অনেক মেয়েদের নামে শোনা ঘটনা দিয়ে ভাবনাটাকে মেলানোর চেষ্টা করতেছিলাম। পরেক্ষণেই সে আবার বলে দিলো-- "মেয়েরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটনাগুলাতে সিম্প্যাথি পায়-- তাই পরে আরো ভয় করে না। মেয়েরা কম যায়না মনে রাখিস....." আমি পুনর্বার ভ্যাবাচ্যাকে খেয়েছিলাম! সত্য মিথ্যা জানিনা, যে বলেছিলো সে অন্য অনেকের চাইতে গভীর চিন্তাশীল বলেই জানতাম, মন্তব্যগুলোকে উড়িয়ে না দিয়ে বিব্রত হয়েছিলাম।

এখন জীবনের বেশিরভাগ (পড়ুনঃ সমস্ত) ইমোশন বিয়ের আগেই শেষ। ফোনে, রেস্টুরেন্টে, ধানমন্ডি লেকে গিয়েই মনের, দেহের সব 'চাওয়া'গুলা পূর্ণ হয়ে যায়। টিএসসিতে, পার্কগুলো, রেস্টুরেন্টগুলোতে ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে বসে দেহের উষ্ণতা নেয়াটাই আমাদের 'স্বাভাবিকতা'। এই রামাদান মাসেও রিকসার মাঝে অদ্ভূত সন্নিবিষ্টতার উদ্দাম তারুণ্যকে দেখেছেন -- এমন মানুষও কম নেই। অথচ এমন করেই একদিন মিউচুয়াল "ব্রেক আপ" হয়ে যান' আমাদের আপু আর ভাইয়ারা... আবার শুরু হয় নতুন কারো খোঁজ... অন্তহীন অক্লান্ত খোঁজাখুজি। ফেসবুকে অনবরত প্রোফাইলে ভ্রমণ করে, বন্ধুদেরকে ত্যক্ত-বিরক্ত করে অনুরোধ করে, এয়ারটেলে কল করে হাবীবের গান "বলে ওঠো আজ না বলা কথা" শুনে গিয়ে নতুন ছেলে-মেয়েদের মাঝে বন্ধু খোঁজা, গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড খোঁজা আমাদের ভালোবাসা। তারপর, আবার সেই পুরোনো লুপ। শেষ কোথায় হয় --কেইবা জানে!

এখন বন্ধুদের মাঝে স্বাভাবিক আড্ডাচ্ছলে প্রশ্ন হয়--"ওর কয়টা অ্যাফেয়ার ছিলো?" উত্তরে দুই বা ততোধিক শোনা বিচিত্র না। বরং এটাই এই প্রজন্মের কাছে "স্বাভাবিক" হিসেবে পরিগণিত। "ধার্মিক" বলে দাবী করা একজন বোনের মুখে অপর ভাইয়ের "আগের গার্লফ্রেন্ডটাই এখনো আছে কিনা" টাইপের প্রশ্ন শোনার পর নিদারুণ

হতাশায় একটা দিন কেটেছিলো আজো মনে আছে। বিবাহপূর্ব সম্পর্কের জোয়ারে ভেসে যায় তরুণ সমাজ, বন্ধনহীন সংসার যেটাকে বলা হয়... আআহ! আমাদের ভালোবাসারা!

সেদিন শুনলাম আমার ইংলিশ মিডিয়ামে ক্লাস সেভেনে পড়া কাজিন (বোন) বলতেসিলো তাদের মাঝে "ক্রেজি" নামক খেলা আছে। কে কত বেশি 'ক্রেজি' কাজ করতে পারবে। নির্দিষ্ট কয়েক ধাপের পর যে 'সিলেক্ট' হবে, মোস্ট ক্রেজি কাজ হচ্ছে বড় ভাইয়াকে গিয়ে একটা 'অফার' দিতে হবে। শুনেই কান গরম হয়ে গিয়েছিলো আমার! এটাই নাকি সিম্পল, এটাই নাকি গেম! কী জানি বাপু, ১০ বছর আগে ফেলে আসা বয়েসের খেলাধূলা তো এমন ছিলোনা! আসলে, আমরা তো আধুনিক হচ্ছি। তাই, অমন সহজেই কান উষ্ণ হওয়াটাও আমাদের কানের আধুনিকতা।

আরো অনেক কিছুই আছে, বলতেও আর আগ্রহ পাচ্ছিনা। পারলে অন্যসময় বলবো। তবে একটা কথা না বললেই না -- আমাদের এই তারুণ্যে, এই যৌবনে, এই সমাজে আজ কিছু ক্ষত দেখা দিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষততে ঘা হয়েছে। ভয় হয়, এই ঘা যখন গ্যাংগ্রিনে পরিণত হবে -- তখন আমরা কোথায় যাবো। গোড়া থেকে কেটে ফেলে কতটুকু কী রক্ষা করতে পারবো জানিনা! সেদিনের আগেই যদি সচেতনতা না আসে, সেদিনের আগেই যদি আমরা না বুঝি আমাদের স্রষ্টা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক যেই গাইডলাইন দেয়া হয়েছিলো -- তার মাঝেই "আলটিমেইট" মুক্তি, তাহলে অনাগত ভয়াবহ দিনের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে আসে না।

এই সৃষ্টিজগতের জটিলতম সৃষ্টি মানুষ, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে কীভাবে চলতে হবে, কী করে চললে তার পারফরমেন্স হবে সবচাইতে ভালো, সুস্থ আর সুন্দর তার যাবতীয় নির্দেশনা দিয়েছেন সেই মহান শিল্পী, মহান স্রষ্টা। তাই দুনিয়া আর আখিরাত -- উভয়

জগতের অনন্ত ক্ষতি থেকে বাঁচতে হলে তার প্রদর্শিত পথে ফিরে যাবার মাঝেই আছে সফলতা। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন।

* * *

দ্রষ্টব্য: লেখায় ব্যবহৃত ডাবল কোটেশন (" ") চিহ্নগুলো উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে শব্দে ব্যবহার হয়েছে বিশেষ অর্থে বোঝানোর আবেদন স্বরুপ।

আমার স্বামীর ডায়েরি

১

সকাল থেকে মন ভালো লাগছে না, ইউসুফের সাথে আজ ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়া হলেও ছেলেরা কী সুন্দর কাজেকর্মে লেগে যায়! অথচ আমার তো কিছুতেই মন বসে না। অবাক লাগে! একটা মানুষ কীভাবে এতো ঝটপট সব ভুলে কাজে লেগে যায়! ওর তো ঝগড়া করেও কোনো ক্ষতি নেই, কী চমৎকার গটগট করে অফিসে চলে গেল। এদিক আমার বারোটা বাজে। রান্নায় মন বসল না, বান্ধবী ঘুরতে যাওয়ার জন্য ডাকল তাও যেতে ইচ্ছা হল না, চুলার রান্নাটা অন্যমনস্কতায় পুড়ে ছাই হল।

কিন্তু কাজের কাজ একটা হয়েছে বৈকি! রাগ ভুলতে ঘর গোছাতে শুরু করেছিলাম। অনেকদিনের পুরোনো ড্রয়ারটা দেখে ভাবলাম গুছাই। কখনও এটায় হাত দেওয়া হয় না। ভেতরে রাজ্যের ফেলনা জিনিস, মাকড়সার জাল, আর ধুলো-ময়লা জমে টাল পড়ে আছে। গোছাতে গিয়ে ড্রয়ারের মধ্যে একটা ডায়েরি পেয়ে গেলাম—ইউসুফের ডায়েরি! বাহ! ইউসুফ ডায়েরি লেখে কখনও বলেনি তো! ভেতরে অজস্র গুটি গুটি লেখা। প্রায় পুরোটা ডায়েরি ভরা লেখাতে। জানি অন্যের ব্যক্তিগত লেখা এভাবে পড়া অন্যায় কাজ কিন্তু কৌতূহলে আমার মন ভরে গেল! কিছুক্ষণ দোমনা-দোটনা করে শেষপর্যন্ত কৌতূহলের কাছেই হার মানলাম।

কয়েকপাতা উল্টেই বুঝলাম, এই ডায়েরি লেখা হয়েছে আমাদের বিয়ের প্রায় দেড় বছর আগে। ২০১২ তেই বেশিরভাগ লেখা, শেষ হয়েছে ২০১৩ তে। কী লেখা আছে এখানে? কোথায় গেল আমার ঘর গোছানো! কোথায় রান্না! ডায়েরিতে মুখ গুঁজে বসে গেলাম। আজই আমি ডায়েরিটা পড়ে শেষ করতে চাই..

২৩ জানুয়ারি ২০১২

ভার্সিটি শুরু করেছি প্রায় তিন বছর হয়ে গেল। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি কখনোই আমার অতোটা ভালো লাগে নি। জীবনে নারী বলেও কেউ নেই। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা ছেলে আমি, বাবা রিটায়ার্ড হয়ে যাওয়ার পর থেকে পারিবারিক একটা চাপ তো আছেই। নিজেকে বরাবর খুব অথর্ব মনে হয়, সংসারের দায়দায়িত্ব তেমন কিছুই নিতে পারছি না। একসাথে টিউশন আর লেখাপড়া করে ঠিকমতো নিজের খরচ জোগাতেও কোমর ভেঙে যাওয়ার জোগাড়। দু-একজন কাছের বন্ধু, ক্লাস-পড়াশোনা-পরীক্ষা আর টিউশনি নিয়ে নিস্তরঙ্গ জীবন চলছিল একরকম। এর বেশি মাতামাতি করার সামর্থ্যও নেই, ইচ্ছাও নেই। ক্লাসের ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে বন্ধুবান্ধব সবাই এখন গার্লফ্রেন্ড সাথে নিয়ে ঘুরে, একজন অতিরিক্ত নারীর বিলাসিতা আমার জীবনে এখন নেই বলেই আমি মেনে নিয়েছি। তাই ওদিকে কখনও নজর দেই নি। মনের মধ্যে কারো ভাবনা এলেও দূরে ঠেলে সরিয়েছি। বার বার নিজের মনকে শাসন করেছি।

কিন্তু তবুও সব এলোমেলো হয়ে গেল। ঝড়ের মতো দু'টি চোখ এসে তছনছ করে দিল সবকিছু—আমার এতোদিনের চিন্তা-চেতনা, ধ্যানধারণা, লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ততা, পরিবার নিয়ে দুর্ভাবনা, ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ সব নিমিষেই কোথায় যেন মিশে গেল। তার বদলে শরীরে ভর করল অদ্ভুত এক মাদকতা! এই মাদকতার স্বাদ আমি কোনোদিন পাই নি। যেন বসন্তের হাওয়া আমাকে মাতাল করে দিচ্ছে, যেন দূরে কোথাও থেকে একটা সুর এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে নিচ্ছে, যেন সমুদ্রের অতল গহ্বরে আমি হারিয়ে যাচ্ছি, ডুবছি, ডুবছি, চিরদিনের মতো—এই ডোবার কোনো শেষ নেই।

ইমা। সেই স্বপ্নের রাজকন্যার নাম।

২৬ জানুয়ারি ২০১২

কী হল? কেন হল? কীভাবে হল? কিছুই বুঝতে পারছি না। নিজেকে যুক্তিবাদী বলেই সবসময় বিশ্বাস করে এসেছি। কিন্তু আজ আমার সব বোধবুদ্ধি থমকে গেছে।

আচ্ছা, একটু শুরু থেকেই বলি। স্কুল-কলেজে প্রেম করা তো দূরের কথা, গত তিন বছরের ভার্সিটি জীবনেও ক্লাসের কোনো মেয়েকেই আমি তেমন পাত্তা দেই নি। পড়ায় আমার কারো সাহায্য নেওয়ার দরকার হতো না। উল্টো আমার কাছেই সবাই পড়া বুঝতে চাইত, নোট নিতে আসত। পার্টি, শিক্ষাসফর জাতীয় ইভেন্টগুলোয় ক্লাসের মেয়েদের সাথে টুকটাক কথা হয়েছে--মেয়েদের সাথে আমার বন্ধুত্ব বলতে গেলে এ পর্যন্তই। মাঝেসাঝে ক্যাম্পাসের মাঠে আড্ডার সময় বন্ধুদের 'গার্লফ্রেন্ড'রাও আসত। কী সব ন্যাকা ন্যাকা মেয়ে বাবা! হয়ত বয়ফ্রেন্ডরা সামনে থাকত বলেই ন্যাকামিটা যেন আরেকটু বেড়ে যেত। এই ধরণের মেয়েকে আমি কখনোই মন থেকে পছন্দ করতে পারিনা। কিন্তু ইমা! আমার হৃদয়ের রাণী ইমা! ও সবার থেকে সত্যিই আলাদা! ওর হয়তো এই ভার্সিটিতে পড়ার কথাই ছিল না! বিদেশের ভার্সিটিতে পড়ত। বাবা বিশাল বড়োলোক। দু'বছর আগে ওর মা খুব অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় আমেরিকা চলে যায় ওরা। এরপর ওখানেই পড়াশোনা শুরু করে ইমা। কিন্তু মা মারা যাবার পর ব্যবসার কাজে দেশে ফিরতে হয় ওর বাবাকে। আর একমাত্র মেয়েকে চোখের আড়ালে রেখে উনি কোনোমতেই ফিরতে রাজি না। তাই ইমা ক্রেডিট ট্রান্সফার করে এই ভার্সিটির শেষ বর্ষে ভর্তি হলো। আর একেবারে আমার ডিপার্টমেন্টেই এসে পড়লো!

এমনও কি হয়?!

গল্প-সিনেমায় হলেও একটা কথা ছিল। আমি ভাবতেও পারিনা ইমা আমার ক্লাসের একজন! অন্য সব মেয়ের থেকে ও একদম ভিন্ন। যেন অসংখ্য ঘাসফুলের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো একটি সদ্য ফোটা লাল গোলাপ। ওর তাকানো, ওর কথাবার্তা, ওর

চালচলন, পোশাক-আষাক সবকিছুতেই স্পষ্ট একটা রুচির ছাপ। বড়লোকি উগ্রতা নেই, নেই মধ্যবিত্ত কুণ্ঠিত ভাব, আর গরিবের সাথে তো ওর তুলনাই চলে না। ও যখন কথা বলে তখন সবাই তাকিয়ে থাকে, ক্লাসের ছেলেরা তো বটেই, মেয়েরাও ওর নামে বাজে কথা বলতে ভয় পায়, সবাই যেন সমীহ করে চলে ওকে। কখনও এই ভার্সিটিতে ক্লাস করে নি, কিন্তু হঠাৎ এসেও সবার সাথে মিশে গেল দু'দিনেই। ক্লাসের সবচেয়ে প্রাণোচ্ছল মানুষটি ইমা, ইমাকে ছাড়া এখন সি-সেকশন কল্পনাই করা যায় না। একদিন ক্লাসে আসেনি, ওমনি সবাই ওর জন্য অস্থির হয়ে গেল! এমনকি স্যাররা পর্যন্ত ওর খোঁজ করছিল। ইমা! কেমন একটা আবেশ ছড়িয়ে রাখে ওর চারপাশে, ফুলের মিষ্টি সুবাসের মতো, ও থাকলে আনন্দ, আর না থাকলে সেই শূন্যস্থান পূরণের কেউ থাকে না।

২৭ জানুয়ারি, ২০১২

এখনও ইমার সাথে সামনা-সামনি কোনো কথা হয় নি। কিন্তু ঐ দুটো চোখে চোখ পড়েছে। পাগলের মতো সেদিন সবকিছু ভুলে গেছি। ক্লাসের পড়া পারিনি, স্যারের রোল কলে সাড়া দেই নি, পরীক্ষার মাঝখানে খাতা দিয়ে বেরিয়ে গেছি। রাতে গায়ে জ্বর উঠেছে। উত্তেজনা থেকেই কি এমনটা হচ্ছে?

কোনো মেয়েকে এতো তীক্ষ্ণ আর গভীর দৃষ্টিতে তাকাতে দেখি নি। যেন একবার তাকিয়েই আমার ভেতরের সব খবর জেনে যাচ্ছিল ইমা!

ইমা! কোনো কথা হয়নি ঠিকই, তবু যেন চোখে চোখে একটা সেতুবন্ধন হয়ে গেল। যেন ইশারায় বলে দিল সেও আমাকে পছন্দ করে। ক্লাসের সব ছেলের আরাধ্য ইমা কি সত্যি আমাকে চায়? এ প্রশ্নের উত্তর আমায় কে দেবে! ওহ, আমি পাগল হয়ে যাব!

২৯ জানুয়ারি, ২০১২

আজকের দিনটি আমার স্মৃতিতে সেরা দিন হয়ে থাকবে। আজকে প্রথমবারের মত ইমার সাথে আমার কথা হয়েছে।

ইমার সাথে কীভাবে কথা বলব, কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ছেবলা ছেলেদের মতো পিছে পিছে ঘুরে মেয়ে-পটানোতে আমি অভ্যস্ত নই। আর ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠি লেখার যুগও শেষ।

একদম হঠাৎ করেই একটা সুযোগ এসে গেল। কোনোদিন যা করিনি, অনিকের চাপাচাপিতে আজ তাই করলাম দুজনে মিলে গেলাম জন্মদিনের দাওয়াতে। ক্লাসেরই কোন মেয়ের যেন জন্মদিন পার্টি। এসব পার্টিতে যোগ দেওয়ার প্রশ্নই আসে না, তাও আবার মেয়েদের বাসায় গিয়ে! কিন্তু মনে হচ্ছে যেন প্রকৃতি, পৃথিবী, স্রষ্টা সবাই চায় আমাদের দেখা হোক, কথা হোক, ভালোবাসা হোক। তাই অনিকের অনুরোধ আর ফেলতে পারলাম না। তখনও জানতাম না যে ইমাও সেখানে আসবে।

ক্লাসের পড়াশোনা পারি দেখে আমার একটা আলাদা দাপট আছে। সবাই বেশ ভাব করতে চায় আমার সাথে। কিন্তু পার্টিতে আমি একেবারেই আনাড়ি! এক কোণায় চুপচাপ বসে আছি, হঠাৎ একটা ডাক শুনে চমকে উঠলাম। ইমা!

- এই যে শুনছেন, এখানে একা বসে আছেন কেন?

- এইতো মানে ... কী বলব বুঝে না পেয়ে বিব্রত একটা হাসি দিলাম আমি! নিশ্চয়ই আমাকে খুব বোকার মত দেখাচ্ছিল!

ইমা বোধ হয় বুঝতে পারল। অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে বলল, "চলুন, বারান্দায় গিয়ে বসি, আশা করি আমার সঙ্গ খারাপ লাগবে না"।

ইমার পেছন পেছন মন্ত্রমুগ্ধের মত হেঁটে বারান্দায় গেলাম। কত কথা হল ওর সাথে! যেন হাজার বছরের পরিচয়।

ইমা খুব মিশুক মেয়ে, একদিনের পরিচয়েই অবলীলায় নিজের কথা, নিজের পরিবারের কথা, ভালো-মন্দ সব দিকের কথা বলে দিল। ওদের এতো সম্পদ নিয়ে ওর কোনো বড়াই নেই, দেবীর মতো ঝলসানো রূপ কিন্তু সেই সুন্দর মুখে কোনো অহংকার নেই। আমিও গড়বড় করে অনেক কথাই বললাম। আমার গ্রামের পরিবারের কথা, ছোটো বোনের কথা, জীবন নিয়ে আমার পরিকল্পনার কথা।

আমি প্রেমে বিশ্বাসী না শুনে ইমা তো হেসেই খুন! বলে কিনা আমি নারীজাতিকে ভয় পাই। আসলে ভয় না, বললাম, আমার কাঁধের সব দায়িত্ব শেষ না করে কোনোভাবেই নতুন সম্পর্কে জড়াতে রাজি নই।

ইমা একথা শুনে অবাক মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল। এরপর মৃদুস্বরে বলল, "আপনি সত্যি অন্যরকম, অনেক বেশি দায়িত্ববান"।

২

সেই ছিল শুরু। ইমার সাথে এভাবেই তাহলে ইউসুফের দেখা হয়। ইমার কথা কখনই আমাকে কিছু বলে নি ইউসুফ। ঊনত্রিশ জানুয়ারির পর আরও আছে ওর অসংখ্য লেখা, সেখানে ইমার খুঁটিনাটি বিবরণ। পড়তে পড়তে মেয়েটাকে যেন চিনে ফেলেছি, এখন সামনে দেখলেই চিনে ফেলব।

জানুয়ারি থেকে শুরু করে প্রতি মাসেই পনেরো-বিশটা করে লেখা। মে মাস পর্যন্ত পড়তে পেরেছি। ইমার সাথে ইউসুফের বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হল, ওদের সম্পর্ক 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নামল। ওরা প্রায়ই বাইরে ঘুরতে বেরোত। উপহার আদান-প্রদানও হত! ইমার দেওয়ার হাতই বেশি লম্বা ছিল বোঝা যায়। ইউসুফকে এক বসায় দশ সেট শার্ট কিনে দিত। কিন্তু ইউসুফকে খারাপ লাগতে দিত না। নার্সারি ঘুরতে গিয়ে সেখান থেকে ইউসুফের টাকায় নিজের জন্য হয়তো পাঁচটা গাছ কিনে নিত। দু'জন মিলে অ্যাডভেঞ্চারও কম করে নি! ঢাকার বাইরেও আরও অনেক জায়গায় গেছে দুইজন! বিয়ের আগেই এত কিছু!

পড়তে পড়তে আমি কখনও কাঁদছি, কখনও ইমার স্থানে নিজেকেই রেখে কল্পনা করছি। আমার সঙ্গে ঘোরার জন্য ইউসুফের এত সময় নেই। অথচ ও এতটা রোমান্টিক! এতটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল একটা মেয়ের সাথে!

কিন্তু কী হয়েছিল তারপর? কেন ইমার সাথে বিয়ে হল না? ইমা খুব বড়লোকের মেয়ে বলেই কি ওর পরিবার রাজি হয় নি? খুব জানতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু ইউসুফের আসার সময় হয়ে যাওয়ায় আজ আর পড়তে পারব না। আবার আগামীকালের অপেক্ষা! এই অপেক্ষার প্রহর বড্ড কঠিন লাগছে...।

খাবার টেবিলেও আজকে ইউসুফের সাথে কথা বলি নি। এমনকি ও বাসায় ঢুকে যখন সালাম দিল, আমার উত্তরটা দিতে খুব কষ্ট হয়েছিল। সাধারণত ঝগড়া হলেও সালাম-খাবার এসব নিয়ে আমি এমন করি না। সালাম দিলে উত্তর দিই, খাবার সময় এটা-সেটা এগিয়ে দিই। বলতে গেলে এভাবেই আমার রাগ অর্ধেকটা পড়ে যায়। কিন্তু আজ ইমার কথা পড়ে এত রাগ আর হিংসা হচ্ছে যে, কিছুই করতে মন টানছে না। থাকুক ও নিজের মতো। পুড়ে যাওয়া তরকারি দিয়েই ইউসুফ নিঃশব্দে খেয়ে গেল। কোনো অভিযোগ ও আমার রান্নার কখনোই করে না, আজও করল না। কিন্তু তবু আজ ওর

প্রতি কোনো কৃতজ্ঞতাও এলো না আমার। যদিও বুঝতে পারছি, যা ঘটেছে বিয়ের আগেই সবকিছু। কিন্তু তারপরও একটা অবুঝ আক্রোশে আমার মন ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। মনে হচ্ছে একটা লম্পট, ধোঁকাবাজের সাথে সংসার করছি। রাতে শোওয়ার সময় ও আমার রাগ ভাঙাতে এসেছিল, "বউ, তোমার এতো অভিমান কেন? এখনও কথা বলবে না?" আমি কোনো কথার জবাব দিই নি। কী জবাব দেব? আমার মন যে দাউদাউ করে জ্বলছে! ডায়েরি পুরোটা শেষ না করার আগ পর্যন্ত আমার অন্তরের আগুন বোধ হয় আর নিভবে না। সাড়াশব্দ না পেয়ে একসময় ও ঘুমিয়ে পড়লো। আর আমি বিছানায় ছটফট করে এদিক-ওদিক করতে লাগলাম।

৩

পরদিন ইউসুফ বাসা থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই আমি ডায়েরি নিয়ে বসেছি। পুরোটা আজ শেষ করেই ছাড়ব..।

১২ এপ্রিল ২০১২

ছয় মাসে কি একটা মানুষকে চেনা যায়? কিন্তু আমার মনে হয় ছয় মাস কেন, ইমাকে বুঝতে আমার তিন দিনও লাগেনি। এতো কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা যে, ইমা আমার জন্য সব করতে রাজি, সব ছাড়তে রাজি। মানুষ মানুষকে কতোটা ভালোবাসে, আদৌ ভালোবাসে কিনা সেটা জানা যায় তার ত্যাগ দেখে। ইমা এতো বড়োলোকের মেয়ে হয়েও আমার জন্য সেই জীবন ছাড়তে ওর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। ওর বাবার সাথেও কয়েকবার আমার কথা বলে ফেলেছে।

খুব দুশ্চিন্তা হতো আমার ইমাকে নিয়ে। সামাজিক স্ট্যাটাসের দিক থেকে এত দূরত্ব আমাদের, কীভাবে বিয়ে হবে? কিন্তু ইমা আমাকে আশ্বস্ত করে বলে, সব হয়ে যাবে। ওর বাবার একমাত্র সন্তান ও, বাবা ওর কথা ফেলবেন না। ইমার কথায় আমি ভরসা

খুঁজে পাই, কারণ জানি, ইমা বাজে কথা বলার মেয়ে না। ও যা বলবে তা করেই ছাড়বে।

ইমাকে যদি আমি ডাকি এক ডাকে ও আমার বিছানায় আসতে রাজি হবে। শরীর দেখানো মেয়ে ও না, কিন্তু আমার জন্য ও সব করতে পারে সেজন্যই আসবে। আমাকে স্বামী হিসেবেই ও মনে মনে মেনে নিয়েছে। কিন্তু এসব করতে আমার বিবেকে বাধে। সতীত্বের দাম নিশ্চয়ই আছে। আর ইমার দায়িত্ব না নিয়ে ওকে ভোগ করা স্বার্থপরতার শামিল।

তবু আজকের মতোই কত রাত ওকে একটু কাছে পাওয়ার জন্য ছটফট করি! এ কথা কী ইমা বোঝে? নিশ্চয়ই বোঝে।

২১ এপ্রিল ২০১২

গত কয়েকদিন লিখতে পারিনি। ডায়েরি লেখা আরম্ভ করার পর এই প্রথম এতদিন গ্যাপ গেল। প্রচণ্ড জ্বর এসেছিল। শরীর অবসন্ন, দুর্বল হতে হতে বিছানা থেকে নামার মত অবস্থাও ছিল না। হল থেকে বেরোতে পারিনা, তাই ইমার সাথেও দেখা হল না প্রায় দশ দিন! বাড়িতে সময়মত টাকা পাঠানো গেল না। একটা ক্লাসটেস্ট মিস হয়ে গেল।

খারাপের মধ্যে ভালো একটাই, একটা অসাধারণ ছেলের দেখা পেলাম! আমাদেরই ডিপার্টমেন্ট, কিন্তু অন্য সেকশনে পড়ায় আগে ওর সাথে তেমন আলাপ হয় নি। মাঝেমধ্যে পড়া বুঝতে ঘরে আসত, একসাথে কয়েকজনের সাথে আসত বলে আলাদা করে কথা হয় নি। শুধু নামটা জানি—রেহান। পরিচয় বলতে এতটুকুই। কিন্তু আমার শরীর খারাপ শুনে 'ইউসুফ ভাই, ইউসুফ ভাই' করে দৌড়ে এসেছে! কিছু মানুষের

আন্তরিকতা একদম ভেতর থেকে আসে বোঝা যায়। এই ছেলেরও তেমন। ঠিকমতো ওর নামটাও আমার মনে ছিল না, অথচ কী সেবাটাই না করল আমার।

দিনে-রাতে আমার খোঁজখবর নেওয়া, নিজের পকেটের টাকা খরচ করে ওষুধ-পত্র কেনা, খাবার-দাবার ঠিকমত খাচ্ছি কিনা সেদিকে নজর রাখা। এক ঝুড়ি ফলও কিনে মাথার কাছে টেবিলটায় রেখে দিয়েছিল, যদি কিছু খেতে ইচ্ছা করে! অথচ রেহানও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা ছেলে, তারও হাতখরচ নিয়ে টানাটানি। তবু কত করল! আসলে মানুষের মনটাই ব্যাপার। এই ছেলের হাতে টাকা থাকলে আরও করত। যা করেছে সেটাই কজনা করে! সুস্থ হওয়ার পর ওর চেহারায় যে হাসিটা ছিল, একদম অকৃত্রিম! সেদিনই বাইরে নিয়ে আমাকে বিরিয়ানি খাওয়ালো, জোর করে দুজনের বিল মেটালো। এরপর হাত ধরে বলল, "ভাই, আমাদের একটা আড্ডায় আসেন, দ্বীন ইসলামের কথাবার্তা হয়, আপনি আসলে খুব খুশি হব"।

ধর্মীয় দিকটা নিয়ে আমি কখনও ভাবার তেমন সুযোগ পাই নি। সে অবসরই হয়নি আমার। কিন্তু রেহানের কথাটা ফেলতে পারলাম না, তাই বললাম যাব।

কিন্তু যাবো বলেও বিপাকে পড়েছি। এই ধরণের আড্ডায় কখনও যাই নি, যেতে মোটেও ইচ্ছা হচ্ছে না। এখন আবার অজুহাত খুঁজতে হবে, কেন যাই নি। ভাবছি আগামী কয়েকদিন রেহানকে একটু এড়িয়ে চলতে হবে। কেন যে অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে যাই! ভদ্রভাবে বলে দিলেই পারতাম, ভাই এসবে আমার আগ্রহ নেই। এরচেয়ে একটা বিকাল ইমার সাথে কাটানোও অনেক চমৎকার! আহ, কতদিন ইমার মুখটা দেখিনা! পাখির নীড়ের মতো সেই দুটো চোখ...

২২ এপ্রিল ২০১২

ঠিক দশদিন পর আজ ইমার সাথে দেখা। আমার জ্বরে-ভুগে-ওঠা ফ্যাকাসে চেহারার চেয়েও ওর মুখটা বেশি ফ্যাকাসে হয়ে ছিল। গত দশদিন যে ওর নাওয়া-খাওয়া-ঘুম কোনোটাই হয় নি, সেটা ও না বললেও বুঝতে পারছিলাম। এত মায়া লাগে ইমার জন্য! ইশ! আমি কি এত ভালোবাসার যোগ্য? আমার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদো কাঁদো গলায় ইমা আমাকে আজ বললো,

- কথা দাও, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও যাবে না
- কথা দিলাম।

২৩ এপ্রিল ২০১২

কথা গুছিয়ে লিখতে আজ বেগ পেতে হবে। খুব উদভ্রান্ত হয়ে আছি আজ। অস্থিরতা কাজ করছে। শনিবার বিকেলে ইমার সাথে দেখা করে এসে রুমে ঢুকেই দেখি রেহান এসে হাজির, সে আমাকে আড্ডায় নিয়ে যেতে এসেছে! আমি তো হতভম্ব! এগুলোকে এতো সিরিয়াসলি নেয় কেউ! ওকে মুখে যাব বললেও যাওয়ার ইচ্ছা আমার মোটেও ছিল না বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঘর থেকে কাউকে বের করে তো দিতে পারিনা। অগত্যা যেতে হল।

নবী ইউসুফকে নিয়ে আলোচনা।

নবী ইউসুফের বাবাও নাকি নবী ছিলেন! জানতাম না আগে। ইউসুফ ছোটোবেলাতেই স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্ন শুনে বাবা বুঝলেন ইউসুফ একজন নবী হবেন। এই ছেলেই ছিল সব সন্তানের মধ্যে তাঁর চোখের মণি। ভাইয়ের প্রতি বাবার এই অতিরিক্ত ভালোবাসা অন্য ভাইদের সহ্য হল না। তারা বুদ্ধি আঁটল, ধাক্কা মেরে ফেলে দিল ইউসুফকে

অন্ধকার কুয়ার মধ্যে। একাকী ইউসুফকে উদ্ধার করল পথের একদল যাত্রী। এরপর সে বিক্রি হয়ে গেল সুদূর মিসরে এক রাজার কাছে।

গল্পের মতো কাহিনি! আগে কখনও শুনি নি! নবী ইউসুফের সাথে জুলেখা বিবির প্রেমের গান শুনেছিলাম। ওরা বললো, এসব নাকি মিথ্যা কথা। নবীদের কেউ এমন অবৈধ প্রেম করেন নি। এমনকি জুলেখা নামটাও কোরআনে নেই! মন্ত্রী আযিযের স্ত্রী ইউসুফকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে, অবৈধ সম্পর্কের জন্য জোর-জবরদস্তি করতে থাকে। সুন্দরী নারী, মোহনীয় ডাক, কিন্তু নবী ইউসুফ! নিজেকে বাঁচাতে, নিজেকে চরিত্রকে পবিত্র রাখতে, এই অগ্নিপরীক্ষা থেকে দূরে থাকতে কারাগারে যাওয়ার জন্য দু'আ চায়! এরপর কয়েক বছরের কারাবাস শেষে ফিরে এসে রাজ্যের উঁচু পদে যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত মিল হয় তার পরিবারের সাথে, তার ভাই আর বাবার সাথে। ভাইদেরকে তিনি মাফ করে দেন।

কাহিনি শেষ করেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা চলল। আরও কয়েকজন সিনিয়র আর জুনিয়র ছাত্রও এসেছিল। প্রেম করা মারাত্মক গুনাহ—এটা নিয়েই প্রায় চল্লিশ মিনিট মতো কথা বলল। আমি খুব সংকুচিত বোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন আমাকে উদ্দেশ্য করেই এসব বলা! অথচ ওরা কেউই ইমার কথা জানে না, জানার কথা নয়। ক্লাসের ছেলেরা ইমার জন্য আমাকে ঈর্ষা করে, কেউ কেউ তো বলেই বসে, দোস্ত, তোর ভাগ্যটা সেইরকম ভালো! শুনে মনে মনে আমার খুব গর্ব হয়! নিজেকে রাজা-রাজা মনে হয়। এটা সত্যি, ইমাকে পাওয়া মানে সত্যি সত্যিই রাজকন্যা আর রাজত্ব একসাথে পাওয়া। ইমারা প্রচণ্ড বড়োলোক, ওর বাবার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ছেলের ভাগ্য রাতারাতি বদলে ফেলা দু'মিনিটের কাজ।

অথচ এই কয়টা ছেলের কথা শুনে মনে হচ্ছে ওরা ইমার কথা জানতে পারলে আমাকে খুব খারাপ ভাববে। একজন একটা হাদীস বললো, পরনারীর গায়ে স্পর্শ

করার চাইতে নাকি লোহার পেরেক দিয়ে কপালে ফুটো হয়ে যাওয়া বেশি ভালো! শুনেই আমি কুঁকড়ে-মুকড়ে গেলাম।

মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন এসেছিল। সঙ্কোচে সবার সামনে শেষপর্যন্ত আর জিজ্ঞেস করতে পারলাম না, প্রেম করা কি এতই খারাপ?

২৫ এপ্রিল ২০১২

সকালে ওঠার পর অস্থির ভাবটা দূর হয়ে গেল। মনটা হালকা খচখচ করছিল, ক্লাস শেষে ইমার সাথে আলাদা করে দেখা করলাম। ওর হাতে হাত রাখলেই আমার রাজ্যের চিন্তা দূর হয়ে যায়। ইমাকে শোনালাম নবী ইউসুফের কাহিনি, ও আগ্রহ নিয়ে শুনল। এরপর এ কথা-সে কথা করে আমরা দুজনেই অনেক কথা বললাম। খচখচে বোধটা কখন উধাও হয়ে গেল টেরই পেলাম না।

৪

- কী হল দরজা খুললে না যে? আওয়াজ শোনো নি?

পড়তে পড়তে ডায়েরির মধ্যে এতো ডুবে গিয়েছিলাম যে দরজার খটখট শব্দ কানে আসে নি। ইউসুফের গলায় চমকে চোখ বড়ো বড়ো করে ওর দিকে তাকালাম!

- তুমি! এখন?

বেলা মাত্র বারোটা বাজে, এমন অসময়ে ইউসুফকে বাসায় আসতে দেখে আমি এতো আশ্চর্য হলাম যে এটাও ভুলে গেছি ওর সাথে আমার কথা বন্ধ! সম্বিৎ ফিরে পেতে খানিকক্ষণ লাগল আমার। এরপর জিজ্ঞেস করলাম,

- এত জলদি কীভাবে আসা হল? চাবি দিয়ে লক খুললে যে? নক করতে পারো নি?

- শরীর খারাপ লাগছিল, তাই আগেভাগেই চলে এলাম। কারেন্ট নেই দেখে কলিং বেল শোনো নি, দরজায় নক করেও কেউ খুললো না, তাই...কিন্তু তোমার হাতে এটা কি! আরে আমার পুরোনো ডায়েরি! এটা তুমি কোথায় পেলে?

- তুমি যেখানে রেখেছিলে সেখানেই নিশ্চয়ই। আর কতো কাহিনি আছে তোমার জীবনে?

আমার হাতে খোলা ডায়েরি দেখে ইউসুফের মুখ থমথমে গম্ভীর হয়ে গেল। ও অসুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছে সে কথা আমার খেয়াল থাকল না, রাগে অন্ধ হয়ে ছিলাম আগে থেকেই, তার ওপর ওর কাছে ডায়েরিসহ এভাবে ধরা পড়ে যাওয়ায় অনেকটা আত্মরক্ষার জন্যই হয়তো আমি আজেবাজে সব কথা বলে ওকে আক্রমণ করতে থাকলাম। ও চুপ করে সব শুনল। এরপর বলল, "তোমার যদি আমাকে নিয়ে সন্দেহ থাকে, তাহলে পড়ো, পুরো ডায়েরিটাই পড়ো। তারপর কথা হবে"।

আমি ডায়েরি হাতে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। বিছানাপত্র সকাল থেকে অগোছালো হয়ে আছে, তাতে কি! আমি শুধু জানি, আমাকে এই কাহিনির শেষ জানতে হবে।

ড্রয়িং রুমে বসে আবার পড়া শুরু করলাম।

এখন আর লুকিয়ে পড়ার ভয় নেই। কিন্তু পাতার পর পাতা পড়ার ধৈর্য্যও হারিয়ে ফেলেছি! রাগে তখন আমার শরীর কাঁপছে। একসাথে কয়েক পাতা উল্টাচ্ছি, এর শেষ আমার জানাই লাগবে! যত দ্রুত সম্ভব! পড়তে পড়তেই বুঝলাম বড় ভুল হয়ে গেছে..

২৯ মে ২০১২

প্রথমদিন যখন রেহানদের আড্ডায় গিয়েছিলাম তেমন ভালো লাগে নি। বিরক্তি, দ্বিধা, সংকোচ, অস্বস্তি সব মিলিয়ে একটা মিশ্র অনুভূতি কাজ করছিল। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা শুনে মনটা কেমন খচখচ করছিল, কিন্তু কারণটা ধরতে পারছিলাম না।

কারণটা আমি এখন ধরতে পেরেছি। নিজেকে মুসলিম দাবি করে আসা এই আমি এতদিন ইসলাম নিয়ে একটুও চিন্তা করি নি। নবীজি (সা) কে বিশ্বাস করি বলেছি মুখে মুখে, কিন্তু উনার সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতাম না, উনার শিক্ষা মেনে চলা তো দূরের কথা! প্রেম নিয়ে আল্লাহর আদেশ আমার কাজের ঠিক বিপরীত। এটাই মানতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু রেহানের সাথে আরও আলাপের পর বুঝতে পারছি আমার এতদিনের ধ্যানধারণা-গুলোতেই ভুল ছিল। বিয়ের বাইরে প্রেম আসলেই গোলমেলে ব্যাপার। সবচেয়ে বড়ো কথা—আল্লাহ আর রাসূলুল্লাহ যা বলেছেন, তা একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের মানতে হবে। মেনে চলার মধ্যেই আমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত।

১৩ জুন ২০১২

আজ রেহানের সাথে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করলাম। মূলত আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম এগুলো নিয়েই। আমার খুব ভয়-ভয় করছে। অন্ধকার বা ভূতের ভয় না, এটা একটা অন্যরকম ভয়! জান্নাত হারানোর ভয়, শাস্তি পাবার ভয়। আখিরাতটা এই জীবনের তুলনায় বিশাল, অনেক বিশাল! সেই আখিরাতে যদি আমি ব্যর্থ হই, তাহলে এই মুহূর্তের জীবনের লাভ-খ্যাতি-টাকাপয়সা-ভালোবাসা কোনো কাজেই আসবে না। ব্যর্থদের দলে যুক্ত হয়ে যাব চিরদিনের জন্য। জাহান্নামের আগুনে পটপট করে আমার হাড্ডি-মাংস-চামড়া পুড়বে, ফুটবে। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসবে না। কোথায় থাকবে সেদিন বাবা-মা-ভাইবোন সবাই! কোথায় থাকবে সেদিন ইমা! ইমা কি আমাকে বাঁচাতে পারবে? নাহ, আল্লাহর বিচারের সামনে সবাই তুচ্ছ।

৩০ জুন ২০১২

ইমার সাথে আপাতত সম্পর্ক না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই সিদ্ধান্তে আসতে আমার অনেক সময় লেগেছে। ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না কেন আমি এরকম প্রেম করতে চাই না!

ইমা! আমি কিছু বলার আগেই যে আমাকে বুঝে ফেলত, সেই ইমা আমাকে এখন কেন বুঝতে চাইছে না?

ওকে এড়িয়ে চলা আমার পক্ষে সম্ভব না! হে আল্লাহ! তুমিই আমার জন্য সহজ করে দাও!

৪ জুলাই ২০১২

ইমাকে ছাড়া থাকা আমার জন্যেও কী যে কঠিন! বিয়ের কথা এই মুহূর্তে চিন্তা করা মোটেই মানায় না, কিন্তু ইমাকে ছেড়ে থাকাও অসম্ভব। প্রেম করব না-করব না বলেও প্রায়ই কথা হচ্ছে আমাদের। ইমাও মরিয়া হয়ে উঠেছে। আমার সাথে যেন কথা বলেই ছাড়বে! ওকে উপেক্ষা করা আমার জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেদিনও ক্লাসের মাঝে খপ করে আমার হাত ধরেছে, মেসেজের পর মেসেজ, ফোনের পর ফোন তো আছেই। এভাবে চলতে থাকলে আমি নিজেকে কতদিন সামলে রাখতে পারব! বিয়ের পর সংসার কোনো না কোনো একভাবে চলেই যাবে, লাগলে ছোটো কোনো চাকরি করব, কিন্তু বিয়ে করাই এখন নিজেকে এই ফিতনা থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ।

বিয়ের মাধ্যমে মানুষের রিযিক বেড়ে যায়, এটা তো আল্লাহর ওয়াদা। তাহলে আমি ওকে খাওয়ানো-পরানোর ভয় কেন পাচ্ছি? ও বড়োলোকের মেয়ে বলেই কি! কিন্তু ও তো কখনো আমার কাছে অনেক জিনিসের দাবি করে নি। ছোটোখাটো একটা বাসা

নিলেই আমাদের চলে যাবে, আর পড়াশোনা নাহয় নিজে নিজেই করব। আর বেশিদিন বাকিও নেই ফাইনাল পরীক্ষার। এর পরেই বিয়েটা সেরে নিলে কেমন হয়?

২৭ জুলাই ২০১২

ইমাকে আজ আমি বিয়ের কথা বলেছি। ও বিয়েতে রাজি! আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ!! আমি জানতাম ও রাজি হবেই। আমার জন্য সব করতে পারে আমার ইমা, আমার আদুরে পাখি ইমা। আজ যে আমি কী খুশি লিখে বোঝানো যাবে না। ইচ্ছা করছে দুনিয়ার সবাইকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করি। চিৎকার করে জানাই, ইমা আমার! আমরা বিয়ে করছি!

রেহান আমাদের বিয়ের সিদ্ধান্তের কথা শুনে খুব খুশি হয়েছে। আমি নিশ্চিত আমার বাবা-মায়েরও অমত হবে না। ইমার বাবাও আমার কথা জানে, তারও নাকি তেমন অমত নেই আমার ব্যাপারে। আমার আর ইমার বিয়ে হলে এই ডিপার্টমেন্ট থেকে এটাই হবে প্রথম বিয়ে!

১৮ আগস্ট ২০১২

ইমার সাথে বিয়েটা মনে হয় না হবে। বিয়ের ব্যাপারটা সহজে মেনে নিলেও ইমা কিছুতেই নিজেকে পরিবর্তন করছে না। ওকে আমি নামাজ আর হিজাবটা অন্তত করতে বলেছিলাম, কিছু বই লেকচারও দিয়েছি। কিন্তু ওর মধ্যে কোনো বদল নেই। আগের মতোই হৈ-হুল্লোড়, সবার সাথে আড্ডা। এমনকি ক্লাসের ছেলেদের সাথেও সেই একই রকম কথা-হাসি-তামাশা। ইদানিং এগুলো সহ্য করা খুব কঠিন লাগে। আমি বহু কষ্টে নিজেকে সামলে রাখি, ইমার সাথে কোনো রাগারাগি করি না। ইসলামকে বুঝতে আমারই তো কতদিন লেগেছে! ইমাকেও সময় দেওয়া দরকার। যেন ও ইসলামের অর্থ বুঝতে পারে।

ইমা না বদলালে আমাদের বিয়ে হলেও টেকার কোনো সম্ভাবনা নেই। ছেলেদের সাথে এভাবে গায়ে পড়ে মেশা, সবাই মিলে হ্যাং-আউট করা, পার্টিতে যাওয়া—এগুলো আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না। এগুলো মেনে নিলে আমার নিজেরও গুনাহ হবে, আল্লাহর কথার অবাধ্য হতে হবে। আর যে মেয়ে এখন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না, সে ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানদের কী শিক্ষা দেবে?

মাঝে মাঝে মনে হয়, এভাবেই ইমাকে বিয়ে করে নিই। হয়তো ও আস্তে আস্তে বদলাবে। কিন্তু বিয়ের আগে এত বলার পরেও যাকে বদলাতে পারছি না, বিয়ের পর তাকে আমি কীভাবে বদলাব! হেদায়েতের মালিক তো আল্লাহ! আমাদের কাউকে বদলে ফেলার কোনো ক্ষমতাই নেই।

১১ সেপ্টেম্বর ২০১২

একই ক্লাসে প্রতিদিন আসি, অথচ ইমার সাথে কথা হয় না অনেকদিন! শুধু দূর থেকে দেখি। তবুও একবার চোখ পড়লেই চোখ নামিয়ে নিই। উহ! কী যে কঠিন নিজের নজরকে হেফাজতে রাখা! বিশেষ করে ইমার সাথে! ইমার চোখে চোখ পড়া মানে বড়শিতে গেঁথে যাওয়া মাছ। যার দিকে একবার ইমা ইশারা করে, সে কখনও সেই দৃষ্টি উপেক্ষা করতে পারে না। মোহনীয় ওর দৃষ্টি, মাতাল করে দেওয়া ওর চোখের ডাক!

আমিও অবশ্য ওর সাথে যোগাযোগ করি, তবে তা কালেভদ্রে। মাঝে মাঝেই ওকে ভালো লেখা পেলে মেসেজ করি, ইসলামি বই পাঠাই, কয়েকজন দ্বীনী বোনের সাথে পরিচিত হতেও বলেছিলাম। বোনগুলোকে আমি চিনিনা, রেহান বললো ওরা নাকি ইসলাম মেনে চলে। ওদের সাথে হয়তো ইমার কথা হয়! কে জানে! আজকে ইমার দিকে একবার চোখ পড়েছিল, দেখলাম ও স্কার্ফ পরা। কী যে খুশি লাগছে! ইমা কি

তাহলে ইসলামের পথে পা বাড়িয়েছে? হে আল্লাহ, তুমি ইমাকে ইসলামের জ্ঞান আর হেদায়েত দান করো! আমি এটাই চাই..।

৫ নভেম্বর ২০১২

কিছু সত্য এত ভয়ংকর কেন? মনে হয় যেন না জানলেই ভালো হতো। অনিকের সাথে কথা বলতে গিয়ে ভয়াবহ ব্যাপার জানতে পারলাম। ইমা নাকি আমাকে বিয়ে করার জন্যই এখন স্কার্ফ ধরেছে! অথচ গতকালই ফোন করে অনেক কান্নাকাটি করে আমাকে বললো, ও নাকি বদলে গেছে! ইসলামের পথে পা বাড়িয়েছে!

আসলে ইমা কখনও "না" শুনে অভ্যস্ত না। বড়োলোকের মেয়ে, ছোটোবেলা থেকে যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। আমি এখন ওর কাছে একটা চ্যালেঞ্জ! আমাকে ওর পাওয়া চাই। তার জন্য ও সবকিছুই করতে রাজি। ও কেন বুঝতে চাইছে না যে আমি বদলে গেছি! আল্লাহকে খুশি করলেই আমি খুশি হই। ও যদি সত্যি ইসলামের দিকে মনোযোগী হতো, তাহলে আমি নির্দ্বিধায় ওকে বিয়ে করতাম। কিন্তু খেলার ছলে ও ইসলামকে নিয়ে যা করছে, তার জন্য ওর প্রতি আমার সম্মান দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। ইসলাম নিয়ে মিথ্যে অভিনয় করার কোনো সার্থকতা নেই। এভাবে ইমা আমাকে কোনোদিনও পাবে না।

২১ নভেম্বর ২০১২

ইমা স্কার্ফ ছেড়ে দিয়েছে। হেদায়েত ব্যাপারটা নিয়ে বেশিদিন অভিনয় করা যায় না। ইদানিং ও আগের চাইতেও অনেক বেশি উগ্র পোশাক পরে আসে। হয়তো আমাকে ভোলানোর জন্য এটাও ওর একটা কৌশল! প্রায়ই অচেনা নাম্বার থেকে ফোন দেয়। মাঝে মাঝে টেক্সট করে বলে খুব জরুরি কথা আছে, কিন্তু ফোন ধরে দেখেছি কথা আর শেষ হয় না, জরুরি কথার অজুহাতে এমন সব কথা হতে থাকে, যা শুধু স্বামী-স্ত্রীর

মাঝেই মানানসই। মিথ্যা বলব না, মাঝরাতে এত একাকী লাগে! ওর ফোন পেলে মনে হয়, ধরি। একটু গলার স্বর শুনি। কোনো কথা বলব না।

কিন্তু আমি জানি, একবার পা ফসকালে আমি পিছলে নিচে পড়তেই থাকব, পড়তেই থাকব। আমাকে টেনে তোলার কেউ থাকবে না। ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনিটা ইদানিং খুব মনে পড়ে। উনিও ইউসুফ ছিলেন, আর আমিও এক ইউসুফ! কত পার্থক্য আমাদের। উনি নারীর ফিতনা থেকে বাঁচতে কারাগারে চলে গিয়েছিলেন, আর আমি জীবনে কত ভুল করেছি, করেই চলেছি!

তবু যেন উনার জীবনের সাথে একটা সূক্ষ্ম মিল খুঁজে পাই। ইমার জন্য তীব্র টান থাকা সত্ত্বেও ওকে এড়িয়ে চলা, ওর ঝলসানো রুপ, নজরকাড়া চোখ আর অঢেল সম্পদের লোভ থেকে নিজেকে বেঁধে রাখা, বন্ধুবান্ধব সবার চাপাচাপিকে উপেক্ষা করে, ওদের সবরকম খোঁটা সহ্য করেও প্রতিদিন শক্ত থাকার চেষ্টা করা—এই সবকিছুর জন্য আমি এই মানুষটার কাছ থেকেই প্রেরণা পাই। সায়্যিদিনা ইউসুফ যদি প্রচণ্ড চাপের মুখেও আযিযের স্ত্রী'র আহবান প্রত্যাখ্যান করতে পারেন, আমি সামান্য প্রেমের আহবান উপেক্ষা করতে পারব না?

৩০ নভেম্বর ২০১২

ভাবতেও পারিনি এমন হবে! চরম দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি! আজ আমার দুঃখের দিন...

আজ সকাল থেকেই ইমার জন্য মনটা খুব আনচান করছিল। ক্লাসে গিয়ে দেখি ইমাকে অপ্সরীর মতো সুন্দর লাগছে। এত ভয়াবহ সুন্দর তার সাজ যে না তাকিয়ে উপায় নেই!

ঠোঁটে কড়া লাল রং, ফর্সা গালে গোলাপি আভা টকটক করছে। কামিজটাও কেমন যেন খুবই আকর্ষণীয়। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি। ইমা আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা দিল ক্লাসের বাইরে যাবার। কি মনে করে আমিও চট করে বাইরে চলে গেলাম। আজ স্যার আসেন নি, তাই ক্লাস হচ্ছিল না। ইমা বের হয়েই আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল...

আজ সর্বনাশ হতে পারত। নফসের তাড়নায় আমিও ভুলের পথে পা বাড়িয়েই দিয়েছিলাম! খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম, শয়তানের ওয়াসওয়াসায় ভুলতে বসেছিলাম আমার এতদিনের পরিশ্রম! কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমত, আমি নিজেকে তা থেকে বের করে আনতে পেরেছি। যে ভয় আমার নিজেকে নিয়ে ছিল, আল্লাহ আমাকে সেখান থেকে রক্ষা করেছেন!

আমি নিজেকে গুটিয়ে নিলে ইমা খুব ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। অনেক কান্নাকাটি করে। ইমা চেয়েছিল আমি যেন ওর রূপের কাছে হার মানি, এরপর বিয়ে করতে বাধ্য হই। নাছোড়বান্দা ইমা। কিন্তু না, আমার পক্ষে ইমাকে এভাবে গ্রহণ করা সম্ভব না। নবী ইউসুফ পেরেছিলেন, আল্লাহ আমাকেও সাহায্য করেছেন। আজ একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম—ইমার সাথে একই ক্লাসে থেকে ফিতনায় জড়ানোর চাইতে বরং পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়াই আমার জন্য উত্তম হবে।

০৭ মার্চ ২০১৩

অনেক কষ্ট করে নিজে নিজে পড়েই পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষার আগের খুব জরুরি সব ক্লাসই মিস দিয়েছি। ইমার কথা ভেবে, নিজের কথা ভেবে নিজেকে দূরে রাখাই শ্রেয় মনে হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ রেজাল্ট বরাবরের মতোই ভালো এসেছে। আল্লাহর কথা ভেবে কিছু ছাড়লে আল্লাহ তার চাইতেও উত্তম কিছু মানুষকে দেবেনই। গত

সপ্তাহে চাকরির জন্য কয়েকটা ইন্টারভিউ দিয়েছি। যে ফলাফল এসেছে, তাতে আশা করি চাকরি আটকাবে না ইনশা আল্লাহ।

কিন্তু ইমার সাথে সুন্দর একটা সংসারের স্বপ্ন ছিল, সেটা বোধ হয় আর হবে না। ইমা আজকাল আরেকটা ছেলের সাথে ঘোরে, কদিনেই বেশ অন্তরঙ্গতা হয়ে গেছে মনে হয়। কষ্ট লাগে, খুব কষ্ট লাগে। আমার ইমা আর আমার নেই! মাঝে মাঝে রাগে অন্ধ হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, তাহলে কেন এতদিন আমার সাথে ছিলে? কেন আমাকে পাওয়ার জন্য এত্তো মরিয়া হয়ে আমার জীবনটা কঠিন করে দিলে? কীভাবে পারলে এত সহজে আরেকজনের সাথে সম্পর্ক করতে?

কিন্তু করা হয় না। বেশি খারাপ লাগলে রেহানের রুমে চলে যাই, গভীর রাত পর্যন্ত কথা হয়। ইমার কথা, দ্বীনের কথা, আখিরাতের কথা। তখন একরকম খুশিও হই। ইমা আমার ছিলই বা কবে! আমার জন্য ইমা না। আমি ইমাকে আল্লাহর জন্য ত্যাগ করেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ এর বিনিময়ে উত্তম কাউকেই আমার জন্য রেখেছেন যে শুধু এই জীবনে না, ওপারের জীবনেও আমার স্ত্রী হবে। আমার জান্নাতী স্ত্রী! আমি মনেপ্রাণে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছি.....।

“হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দান করুন যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ বানিয়ে দিন।” [২৫:৭৪]

৫

একনাগাড়ে এতটুকু পড়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। চোখ পানিতে ভিজে গেছে। মনে অপরাধবোধ কাজ করছে। ইউসুফ কেন আমাকে এসব কথা বলে নি এখন বুঝতে পারছি। অতীতের গুনাহর কথা জানিয়ে অবিশ্বাস আর সন্দেহ সৃষ্টি করা ছাড়া তো

কোনো লাভ নেই। তাছাড়াও ওই জীবনকে অনেক আগেই পেছনে ফেলে এসেছে। এখন ও শুধু আমাকেই ভালোবাসে।

নিজের হাতে ডায়েরির পাতাগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলাম, এরপর আগুন ধরিয়ে দিলাম। অতীতের গুনাহর সাক্ষী রাখার কোনো মানে নেই। কাগজগুলোয় লকলক করে আগুনের শিখারা জ্বলছে-- পুড়ে যাক সব কাগজ, পুড়ে যাক বীভৎস সব স্মৃতি।

ঘরে ঢুকে দেখি ইউসুফ অগোছালো বিছানাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কী নিষ্পাপ মায়াময় একটা চেহারা! মাথার নিচের বালিশটা ভেজা, আমি কেঁদেছি, সেও কেঁদেছে। কী পরিমাণ সংগ্রামই না করেছে মানুষটা আল্লাহর পথে চলার জন্য! যুবতী নারীর ডাকে সাড়া না দেওয়া একজন পুরুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার! সেই সাথে বন্ধুবান্ধবের জোরাজুরি, পিয়ার-প্রেশার, অঢেল সম্পদের মোহ ত্যাগ করা! এরপর ভালোবাসার মানুষকে পর হয়ে যেতে দেখা! সেটাও কী সম্ভব!
কত রাগ ছিল আমার মনে, কত প্রশ্ন, কত কৌতূহল। ঠিক করলাম সেসব কিছু প্রকাশ করে এই ভাঙা অন্তরটাকে আর বিব্রত করব না। আল্লাহ তা'আলা এই মানুষটার ত্যাগের বিনিময়ে আমাকে স্ত্রী হিসেবে পাঠিয়েছেন, যেন আমি মানুষটার মনের যত্ন নিই। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই সংগ্রামী মানুষটার যোগ্য ভেবেছেন, কী করে তাকে কষ্ট দিই! অনেক মমতায় ঘুমন্ত মানুষটার মাথা বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

এত মমতা বোধ হয় শুধু স্বামী-স্ত্রী'র মাঝেই সম্ভব।

একমাত্র আল্লাহই পারেন স্বামী-স্ত্রী' র মাঝে এই গভীর ভালোবাসা ঢেলে দিতে.....

সখী ভালোবাসা কারে কয়

‘ভালোবাসা’ আমার জীবনের অপার বিস্ময়ের একটা শব্দ। সেই কৈশোর থেকে যখন বুঝতে শিখেছিলাম — আমি এই শব্দ দিয়েই পড়েছি কবিতা, সমস্ত গানেই পেয়েছি এই শব্দ। প্রথম পড়েছিলাম রোমিও-জুলিয়েট। কী অপার বিস্ময়কর সেই ভালোবাসা!! কী চরম বিভেদ তাদের দুই পরিবারে, তারপরেও তাদের সেই গভীর ভালোবাসা তাদের নিয়ে গেলো মৃত্যুর টানে। একজন বিষ খেলো দেখে আরেকজন ছুরি বসিয়ে বিদায় নিলো পরপারে। শেক্সপীয়রীয় সাহিত্য — সাহিত্যজগতে সর্বাধিক পাঠ্যগুলোর একটা এই রোমিও-জুলিয়েট, নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমি এই পাঠে শেখার চেষ্টা করেছিলাম ভালোবাসা কী জিনিস।

সবাই বলতো দেবদাসের কথা। সেই কিশোর বয়সেই হাতে তুলে নিলাম শরৎ রচনাসমগ্র। পথের দাবী, দেবদাস, বড়দিদি, মেজদিদি ছিলো আজো মনে রাখার মতন। কিন্তু দেবদাসের জীবনটাও সেইরকম "ভালোবাসার"। পড়তে পড়তে স্বভাবসুলভভাবে নিজেকে বসিয়ে দিতাম দেবদাসের জায়গায়। পার্বতী এলোচুলে যখন বাসায় বসে, আমি বহুদূর থেকে ফিরে তাদের বাড়িতে গিয়ে পার্বতীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবার চেষ্টা করলাম কল্পনায়। তারপর নিজের সমস্ত বিশেষত্ব, প্রতিভা জলাঞ্জলি দিয়ে শহরে ভালোবাসায় চুর হয়ে চন্দ্রমুখীর বাহুবন্ধনে জ্ঞানহারা হবার ব্যাপারটাতে নিজেকে কিছুতেই বসাতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত মৃতদেহ যখন পার্বতীর বাড়ির সামনে পড়ে থাকলো –তখনো সেই ভালোবাসার স্বরূপ উদঘাটনপূর্বক অনুভব করতে না পারার কষ্টে আমি দেবদাসের বিশেষত্ব নিয়ে গল্প করিনি। এই মুভি (বাংলা বা হিন্দী) কোনটাই দেখতে যাইনি। আমি বইয়ের প্রতিটি লাইন যেভাবে গভীরতায় অনুভব করেছিলাম, চলচ্চিত্র সেখানে কোন প্রকৃত "ভালোবাসা" চেনাতে পারবে বলে বিশ্বাস করিনি। আরেকটু বড় হতেই হাবিবের গান খুব ভালো লাগতো — “দিন গেলো তোমার পথ চাহিয়া, মন পোড়ে সখী গো কার লাগিয়া, সহেনা যাতনা, তোমারো আশায় বসিয়া,

মানেনা কিছুতে মন আমার যায় যে কাঁদিয়া, পুড়ি আমি আগুনে...” তারপরের লাইনে ছিলো “যার কথা মন ভেবে যায়, যার ছবি মন এঁকে যায়, যারে হায় এ মন যায়, জীবনে পাবো কি তার দেখা”... শুনতে এত ভালো লাগতো যে কারো জন্য ‘মন পোড়াতে’ ইচ্ছে করতো। শেষের লাইনটা হতাশার — জীবনে পাবো কি তার দেখা। সুরের মূর্ছনায় ডুবে সব জলাঞ্জলি দিয়ে "কারো জন্য" অপেক্ষার ব্যাপারটাতেই ‘ভালোবাসা’ পাওয়া যায় বলে বোদ্ধা বন্ধুদের দাবী ছিলো। আমি আরেকটা স্বরূপ পেলাম, যাকে ঠিক বিশেষায়িত করতে পারলাম না তখনো।

টাইটানিক মুভিটিতে নাকি কেট আর ডিক্যাপ্রিওর ছিলো অমর প্রেম, অনবদ্য ভালোবাসা। ভালোবাসার খোঁজে সেই মুভিটাও দেখেছিলাম। কিশোর ছেলের জন্য উষ্ণতা দেয়া ছাড়া, আর বিশাল টাইটানিকের ডুবে যাওয়ার মাঝে আমি ‘ভালোবাসা’ খুঁজে পাইনি। তারপর ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যাউঙ্গা’ দেখতে বসেছিলাম — সেটাও বন্ধুদের দাবীর ‘অপার ভালোবাসা’ খুঁজে পেতে। পারিবারিক কোন্দলকে বাড়িয়ে দেয়ার ‘চলচ্চিত্র’ কাহিনীর মাঝে বাস্তবিক ‘ভালোবাসা’ আমার খুঁজে পাওয়া হয়নি। শুধু নায়িকার রূপসৌন্দর্যে নিজের ভিতরের বুভুক্ষু প্রেমিকটা আরেকটু ‘বিরহে’ পড়ে গিয়েছিলো।

এই কাহিনীর ফিরিস্তি দিতে গেলে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে যাবো। হয়ত এরকম আরো অন্তত ৫০গুণ লাইন লিখতে হবে — কেবল অভিজ্ঞতা তথা অনুভূতি/ভাবনা শেয়ার করা হবে। কিন্তু আসল কথা হলো–সবকিছুর পরেও ছিলাম অন্ধকারেই। এরপর তারুণ্য পেরিয়ে যৌবনে এলাম। চারপাশে যৌবনের জয়জয়কার। এই যৌবন কোন বাধা মানে না। এই যৌবনে আছে ‘ভালোবাসা’ যেটা বাবা-মায়ের অগোচরে রোমান্টিক হওয়া। সিনেমার নায়িকাদেরকে নিজের ‘প্রেমিকা’, যাকে “আই লাভ ইউ” বলে অ্যাচিভ করা হয়েছে তার মাঝে খুঁজে পাবার শত চেষ্টা। কত বান্ধবীর যে পোশাক বদলে গেলো প্রেমের ফলে! বলাই বাহুল্য, এটুকু আমি শিখেছিলাম যে অপার

ভালোবাসায় পতিত হবার পর সেটা যখন শেকলে আবদ্ধ হয় — তাকে প্রেম বলে। সবই আমার শেখা –আমার পারিপার্শ্বিকে আমি জীবনে এই শিক্ষাটা সস্তায় এবং সর্বাধিক পেয়েছিলাম — 'ভালোবাসা কারে কয়'। দুঃখের ব্যাপার হলো — আমি বুঝিনি। আমি ভালোবাসার 'ডেফিনিশান'টাই বুঝিনি।

কোথায় আমার লাইলি-মজনু, শিরি-ফরহাদ, রোমিও-জুলিয়েট, দেবদাস-পার্বতী, অপূর্ব-প্রভা, শাহরুখ-গৌরি সবাই আমাকে এমন কিছু দিয়ে গেলো। যা আমার জীবন দিয়ে অর্জন করা সম্ভব না। আমি ধুম করে মরে যেতে পারবো না এমন কারো জন্য যে আজ না হয় কাল মরেই যেতো। আমার যেই জীবনটার জন্য আমি দুই-তিনটি বছরের কোনরাতেই মা-কে ঘুমাতে দেইনি, লাথি দিয়ে, পেশাব করে, চিৎকার করে জীবনটা ফ্যানা ফ্যানা করে দিয়েছিলাম যেই মা'র, তার কথা না ভেবে আমি একটা নারীর জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে অমর 'প্রেম' রচনা করে ভালোবাসার সাক্ষর রেখে যাবো বলে বিশ্বাস করিনা, করিনি।

কবিগুরু আমার মত করেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, হয়ত সেদিনও উনি কনফিউজড ছিলেন (কবিতাটির ব্যাকগ্রাউন্ড জানিনা বলে ইউজ ভুল হতে পারে)। বেশ মজার লাইনগুলো। কবিতাংশটা অনেকটা এরকম —

তোমরা যে বল দিবস রজনী
'ভালোবাসা, ভালোবাসা' –
সখী ভালোবাসা কারে কয়?
সে কি কেবলই যাতনাময়!
সে কি কেবলই চোখের জল? সে কি কেবলই দুখের শ্বাস?
লোকে তবে করে কি সুখেরই তরে এমনই দুখের আশ!

ক্যারিয়ারের চিন্তা করে বহু সায়েন্সের বন্ধুদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাংলা-ইংরেজি পড়বি? ওদের উত্তর ছিলো — তাদের চাকরি-বাকরি নাই, এই জিনিস পড়ার প্রশ্নই উঠেনা। সবচাইতে কম চিন্তার গভীরতাসম্পন্ন বন্ধুরাও এই উত্তরটাই দিতো। কী চিন্তা! যেখানে বিশেষ "লাভ" নেই বলে জানে, সেখানে পা দিবে না — এটাই সুস্থ মানবিক গুণাবলী। অথচ, নিশ্চিত "দুখের শ্বাস" সমৃদ্ধ ভালোবাসাতে কারো আগ্রহের কমতি থাকতো না। আমি জীবনের বহুবছর এই "ভালোবাসা" নাক জিনিসটার সঠিক কোন সংজ্ঞা পাইনি। উইকিপিডিয়া টাইপের সাইটের লিঙ্ক দিয়ে লেখাটার ভার বাড়াতে চাইছিনা। সংজ্ঞার চাইতে অনুভূতিটা নিয়েই ভাবছি আপাতত।

আমার বন্ধু ছিলো। তিন বছর সম্পর্কের পর তারা পরস্পরের নামে এমন সব কথা বলে বেড়াত নিজ নিজ মহলে। যেই কথা শুনলে, তার অশ্লীলতা চিন্তা করলে কানে আঙ্গুল দিয়েও নিবৃত্ত হতে পারিনি। প্রভা-রাজিবদের ঘটনাগুলো সেলিব্রিটি বলে কানে এসেছে — অমন দেহসর্বস্ব ভালোবাসা এখন তারুণ্যের মাঝে খুব খুব বেশি এভেইলেবল। আর এই ঘটনাগুলোও একই ছাঁচে বাঁধা। যার জন্য পরান দিওয়ানা বলে সবাই জানতো — কোন এক সময়ের স্রোতে তার প্রতিই ঘৃণা, ক্রোধ জমা হয়ে জিঘাংসা তৈরি হলো... সবচাইতে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো — ভালোবাসি ভালোবাসি বলে যার নাম বলে এসেছি "রিলেশনশিপ স্ট্যাটাসে", পরমূহুর্তে তাকেই "খারাপ, ঘৃণা করি" বলে চিৎকার করার মাঝে যে নিজেরই অতীতকে অস্বীকার করা হয় — সেটা কেন কারো মাথায় আসে না?

আমি ভালোবাসা কারে কয় জানিনা। তবে বুঝেছি এই ভালোবাসা আমরা শিখেছি নাটকের সুন্দরী মেয়েটার প্রতি ছেলেটার শব্দচয়ন থেকে। সিনেমায় ক্যাটরিনা কাইফের, প্রিয়াংকা চোপড়ার হাসিতে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া শাহেদ কাপুরদের অস্থির আচরণ থেকে। আমি পথ চলতে দেখি "দীঘল কালো চুলের বাঁধনে বাঁধুন প্রিয়জনকে", ভুরু প্লাক করে, চুল সিল্কি করে নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করে "ভালোবাসা" ধরে

রাখাটা শিখেছি "গীত, কাহানি ঘর ঘর কী" টাইপ শত-সহস্র সিরিয়াল থেকে। আমার জীবনের সবচাইতে "ক্রুশিয়াল, সফিস্টিকেইটেড" তথা গুরুত্বপূর্ণ আর সংবেদনশীল শিক্ষার ভার আমি টেলিভিশনের থেকে, প্রথম আলোর নকশা আর আনন্দ আলোর পাতা থেকেই শিখছি। অথচ ঢাকার সবচাইতে দামী টিচার "আজমল" স্যারের বাসায় লাইন ধরে অ্যাডভান্স ভর্তি হয়ে নিশ্চিত করি জীববিজ্ঞান শিক্ষা।

আসলে পুরো ব্যাপারগুলোই কেবল বয়ে যেতে দেয়া! সবাই চিন্তা ছাড়াই চালিয়ে দেয়। স্কুল-কলেজের রেজাল্টটা দেখা যায় তাই বাবা মা কনসার্নড। কিন্তু জীবনের এই শিক্ষাগুলোর পরীক্ষার মার্কসগুলো দেখা যায়না বলেই এই আধুনিক বাবা-মায়েরা যার-তার হাতে সন্তানের শিক্ষাটা তুলে দিচ্ছেন। আসলে আমি ভাবছিলাম, ভালোবাসা কী আমাকে জিঘাংসু হতে শেখায়? যাকে ভালোবাসতাম, তার সামনের শুভ্র-সুন্দর দিনের সম্ভাবনা থাকলেই কেন পুরোনো প্রেমিক তার গর্দান নিতে দৌড়ে যায়? তাহলে কেন এই ভালোবাসা? তা কেবলই ভোগের জন্য? ক্ষতিই যদি করতে চাই, তাহলে তো সে আমার নিজের হলেও তার ক্ষতিতে আমার কিছু যেত আসতো না! কী ভয়ংকর আমাদের রূপ! কী ভীষণ স্বার্থপর আমরা!!

ভালোবাসা যেন কেবল আমারই কোর্টের বল! তার অন্যথা হলেই, ভোগ করতে না পারলেই পাশবিক রূপ বের হয়ে পড়ে। এই ইন্দ্রিয়ের ভালোবাসার নামই আসলে ভালোবাসা– লোকে যাকে প্রেম নাম কহে। আমার দেহ, আমার চোখ, আমার কানকে তুমি যতক্ষণ সার্ভিস দিচ্ছ — ততদিন আমি ভালো, তোমায় ভালোবাসি। এর অন্যথা হলেই তোমায় ঘৃণা করি। আবার এই দামী জীবনটা যাদের বছরের পর বছরের কষ্টে, ক্লেদে, পরিশ্রমে বেড়ে উঠেছে — সেই মা-বাবা, ভাই-বোনেরাও দুধভাত হয়ে যায় একটা পুরুষ বা নারীর জন্য, যে আসলে তার ফিটনেস পরীক্ষায় পাসও করেনি। হয়ত প্রিয়জনদের কয়েক যুগের অপজিটে দশদিন কনসিস্টেন্সি রাখার যোগ্যতাও তার নেই।

যিনি আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি করেছেন অপরূপ সুষমায়, যিনি আমাকে জ্ঞান-বুদ্ধি-মেধা দিয়েছেন তাকে ভালোবাসার কথা ভেবেও দেখিনা কখনো। উনি যদি "তোমার জন্য এত করলাম, তুমি আমার দিকে ফিরেও দেখলেনা, এখন তোমার খবর আছে" বলে আমাদের দেখে নিতেন — হলফ করে বলতে পারি এই পৃথিবীময় কেবল ছাই দেখা যেত কমপক্ষে। আমার এই ভালোবাসা কাকে দেবো বলে অনেকদিন ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়িয়েছি। জনমভোর বিদঘুটে ঘটনা, অপবিত্র-অশ্লীল ঘটনার মূলে আমাদের সমাজের লোকের কাছে শেখা "ভালোবাসা"কে খুঁজে পেয়ে আমি ক্লান্ত হয়েছি।

তারপর, একদিন সংকল্প করেছি ভালোবাসাকে নষ্ট হতে দেবো না। সুন্দরতম, প্রিয়তম, প্রেমময়, অন্তরতম জন, যিনি সবসময় আমাকে ভালোবাসতেন, ভালোবাসবেন — আমি তাকেই ভালোবাসবো। সবচাইতে বিপদের দিন যখন জগতের কেউ আমার পাশে আসবে না– সেদিন যিনি বিচারকের সামনে আমার পক্ষে হয়ে কথা বলবেন — তাকে ভালোবেসেই আমি স্বার্থপর হবো। এই স্বার্থপরতায় জগতে ক্ষতি নেই, এই প্রেমে নেই উন্মাদনা, নেই প্রচলিত নোংরা পরিণতি। এই ভালোবাসাতে হোক আমার জগত ভালোবাসাময়। এই ভালোবাসা ছড়িয়ে যাক সৃষ্টি চরাচরে, আমি চাই প্রেমময় পৃথিবী, আমি অর্থহীনতার মাঝে আমার ভালোবাসাকে উজাড় করে দিতে চাইনা। এক ভালোবাসাতেই ভালোবাসা ছেয়ে যাবে আমার চারপাশের মানুষের প্রতি। সবাই পাবে স্বার্থহীন ভালোবাসার স্পর্শ। যার পাওনা কেবল অনন্ত জগতেই, এই ক্ষুদ্র জীবনে তাই ভোগের স্বপ্ন নেই। অথচ সুন্দরতম ভালোবাসা আমি পাবই ইনশাআল্লাহ। এই স্বপ্নটাও দেখতে পারি কেবল উনাকে ভালোবাসবো বলেই! আর তাইতো আমি আর কাউকে হন্তদন্ত হয়ে প্রশ্ন করবো না -- "সখী, ভালোবাসা কারে কয়।"

একজন বোনের প্রশ্ন এবং তার উত্তর

হঠাৎ করে কয়েকটা পেজের এডমিন হয়ে গেছি। যখন পেজগুলোতে ঢুকি মেসেজগুলো দেখে খুবই interesting লাগে। কয়দিন আগে মেসেজে এক মেয়ে একটা প্রশ্ন করেছে। আমার কাছে মনে হয়েছে এই প্রশ্নগুলো আমাদের অনেকের মনেই আছে যারা ইসলাম নিয়ে খুব একটা জানেনা! তাই আমি প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব হয়েছে!!

প্রশ্নঃ আমার একটি প্রশ্ন আছে–ইসলাম এ তো প্রতিটি মানুষ এর জোড়া আল্লাহ আগে থেকে বানিয়েছে...। আয়াতটা কি সত্যি???? তাহলে যে আজকাল অনেক ধার্মিক ছেলে মেয়ে ও প্রেম এর সম্পর্কে আছে। তাহলে কি আয়াতটা ভুল??? আমি যদি আল্লাহ'র কাছে আমার ভালোবাসার মানুষ এর জন্য দুয়া করি তাহলে??? আমি কি ভাবে আল্লাহ'র কাছে দুয়া করব??? এই সম্পর্কে ইসলাম কি বলে??? প্রেম ভালবাসা কি খারাপ??? প্লিজ আমাকে জানাবেন।

উত্তরঃ আসসালামু'আলাইকুম। আপনার প্রশ্ন পড়ে মনে হচ্ছে ইসলাম নিয়ে আপনি খুবই ভয়ংকর ধারণা পোষণ করছেন। আপনার মন সন্দেহবাতিকগ্রস্থ। আমি আপনাকে স্পষ্ট করে কিছু কথা বলবো। আশা করি আপনি বুঝতে পারবেন। যদিও আপনার প্রশ্নটি নারী পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে কিন্তু আমি আপনাকে সতর্ক করে দিতে চাই কারন আপনি কোরআনের আয়াত নিয়ে সন্দেহ পোষণ করছেন। একজন মুসলিম সে যদি মনে করে কোরআনের কোন আয়াত ভুল কিংবা তার কোন যথার্থতা নেই তাহলে সে আর মুসলিম থাকতে পারেনা কেননা আল্লাহ নিজেই কোরআনের সত্যতা দিয়েছেন...

"(এই) সেই মহাগ্রন্থ আল কোরআন এতে কোন সন্দেহ নেই, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এই কিতাব তাদের জন্যই পথপ্রদর্শক" [২:২]

আর তাই কেউ যদি কোরআনের আয়াত কে অস্বীকার করে তাহলে সে আল্লাহকেই অস্বীকার করে, তার মানে সে কাফির! আল্লাহ আমাদেরকে এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করুন...আমীন!

এবার আপনার মূল প্রশ্নে আসি। আপনার প্রশ্নটাকে কয়েকটা অংশে ভাগ করলাম –

[১] প্রত্যেক মানুষের জোড়া কি নির্ধারিত?
[২] প্রেম করা মানে সহজ কথায় বিয়ের আগে নারী পুরুষ অবৈধ সম্পর্ক কি হারাম?
[৩] প্রেম করা অবৈধ হলে অনেক ধার্মিক ছেলে মেয়ে প্রেম করে কেন?
[৪] পছন্দের মানুষের জন্য দোয়া করা যাবে কি?

[#১] জোড়া বিষয়ে কোরআনের স্পষ্ট আয়াত আছে। একটা না, কয়েকটা...

"আমি প্রতিটি জিনিসই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে করে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর" [৫৯:৪৯]

"পবিত্র নিখুঁত সেই মহান স্রস্টা, যিনি জুড়ি সৃষ্টি করেছেন সবকিছুর_উদ্ভিদের, স্বয়ং তাদের (মানুষের) এবং এমন সব কিছুরও যাদের তারা জানেনা" [৩৬:৩৬]

"হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে" [৪৯:১৩]

"হে মানুষ! তোমরা সতর্ক হও তোমাদের সেই মহান প্রভুর ব্যাপারে, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজন মাত্র ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে, আর তাদের থেকেই সৃষ্টি করেছেন বিপুল সংখ্যায় পুরুষ আর নারী" [৪:১]

এসব আয়াত থেকে একথা দিবালোকের মত পরিষ্কার যে মহান আল্লাহ তায়ালা নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন তিনি মানুষকে তার জোড়া বানিয়েই এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এমনকি উদ্ভিদও সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। সুতরাং এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই যে আল্লাহ আমাদের জোড়ায় জোড়ায় তৈরি করেছেন কিনা!

[#২] ইসলামে নারী পুরুষের সম্পর্কের পবিত্র আর বৈধ পন্থা হল বিয়ে। এর বাইরে অর্থাৎ, **বিয়ের আগে** নারী পুরুষের সম্পর্ক, বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড, লিভ টুগেদার এসব সম্পূর্ণ হারাম।

এটা শুধু আপনি নয়, নামাজ রোজা করা মুসলিম ছেলেমেয়েদেরও মেনে নিতে কষ্ট হয়! তার কথা তো আপনিই বললেন যে আপনি অনেক ধার্মিক ছেলেমেয়েকেও রিলেশন থাকতে দেখেছেন। আমরা যারা ইসলামটাকে একটা **পরিপূর্ণ জীবনব্যাবস্থা** হিসেবে মেনে নিয়ে তা জীবনে প্রয়োগ করে দেখাতে পারিনা তার অন্যতম কারন **আমরা ইসলামটাকে দেখি একটা হালাল হারামের লিস্ট হিসেবে**।

আমরা যখন আমাদের প্রবৃত্তির পূজা করতে যাই, যখন সেখানে ইসলামের বাধা আসে তখনই আগে পিছে চিন্তা না করে আমাদের মনে প্রশ্ন আসে why?? Why is this haraam in islam??

আপনি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুনতো এই প্রেম করা নিয়ে কোন প্রশ্ন কি ছোটবেলা থেকে এসেছে? না! আসেনি! আমরা সবাই একটা নির্দিষ্ট বয়স পার করি, যে বয়সটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একই সাথে খুবই ভয়ংকর! যে বয়সটাতে আবেগ, ভালোলাগা, সবকিছু পজিটিভ ভাবা, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি সীমাহীন আকর্ষণ সবকিছু আমাদের চারপাশে গিজগিজ করে!

আর এই বয়সের সরলতা আর ভালোলাগার সুযোগ নেয় শয়তান আর তা কাজে রুপান্তর করে দেখায় কাফির আর ইসলামের বিরুদ্ধ শক্তি যারা **আল্লাহর নয় নিজেদের প্রবৃত্তির পূজা করে**! আর তাই আজকে সমাজে স্কুলে প্রেম, কলেজে প্রেম, ভার্সিটিতে প্রেম, নাটক-সিনেমা-গল্প উপন্যাসে প্রেম! আর এসব দেখে শুধু আপনি নয় অনেকের মনে সেই একই প্রশ্ন why?? Why প্রেম is haraam in islam?? কারণ আল্লাহ মহা পরিকল্পনাকারী! তিনি তার সৃষ্টির জন্য মঙ্গলজনক পন্থাই পরিকল্পনা করেছেন! তিনি মানুষের শরীর আর আত্মিক ক্ষতির আসংখ্য থেকে মানুষকে মুক্ত থাকার ব্যবস্থা করেছেন। অতি সসীম এই মস্তিস্ক নিয়ে আমরা কখনও অসীম মহান আল্লাহর পরিকল্পনা বুঝতে পারবো না! কিন্তু আমরা এই দুনিয়াতেই তার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আর আদেশ অমান্যকারিদের পরিণতি দেখেছি, দেখছি, দেখবো ইনশাআল্লাহ!

আমরা একটা হারামকে শুধু হারাম হিসেবে দেখি কিন্তু একটা হারাম শুধু হারাম নয় এটা অনেকগুলো পথ যে পথে মানুষের অপকার আছে সেই পথগুলোও বন্ধ করে দেয়! ইসলামে মদ হারাম। কিন্তু মদ তো মানুষ ভাল লাগে বলেই খায়!! তাহলে হারাম হবে কেন?? এটা বোঝা আমার আপনার কাছে দুরহ তো বটেই হজরত ওমর (রাঃ) ও বুঝতে পারেননি! তার প্রার্থনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তিনবার আয়াত নাযিল করার পর হজরত ওমর (রাঃ) বুঝতে পারেন কেন মদ হারাম হল! আর আমরা এখন জানতে পেরেছি বর্তমানে বিশ্বে মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ...অ্যালকোহল! মদপান! যেটা আল্লাহ ১৪০০ বছর আগেই হারাম করেছেন!

ইসলামে এরকম অনেকগুলো হারামের একটি হল বিয়ে বাদ দিয়ে কিংবা বিয়ের আগে নারী পুরুষ প্রেমের সম্পর্ক! আর বরাবরের মতই ইসলামকে অন্তরে ধারণ না করে পাশ্চাত্য আর কুফরি সিস্টেমর আধুনিকতা অন্তরে ধারণ করা আজকের তরুণ তরুণী সেই হারামের ধার দারে না! অনেকের কাছে এই হারামের জন্য ইসলাম হয়ে যায় সেকেলে!

তার পরিণতিও হাতে নাতে!! পেটে অবৈধ বাচ্চা নিয়ে হাসপাতালে গর্ভপাত কিংবা রিকশা-সিএনজিতে মূল্যবোধ-নৈতিকতা বিসর্জন কিংবা বয়ফ্রেন্ডের লালসার শিকার হয়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে গণধর্ষণ কিংবা বাজারে অনিচ্ছাকৃত ফাঁস হওয়া ভিডিও কিংবা নিজের অসম্মান পরিবারের অসম্মান আর সবশেষে এত এত অসম্মান সইতে না পারে গলায় ফাঁস!

: আরেহ, না না না!! আমি ওসব করতে যাবো কেন? আমার নিয়ত তো পবিত্র। কি সব বলছেন!

হ্যাঁ আমি জানি! শুধু আপনি না সবাই এমনকি যারা এই পরিণতিগুলো বরণ করেছে তারাও বলেছিল, "না না আমরা তো সত্যই ভালোবাসি!! আমরা এসব করব না!"। সেজন্যই প্রথমে বলেছিলাম ইসলামে কোন একটা হারাম শুধু হারাম নয় এটা অনেকগুলো ক্ষতির পথও রুদ্ধ করে। যে পরিণতি-গুলোর কথা বললাম নিজের প্রতি সৎ থেকে বলুনতো এই পথগুলো কে উন্মুক্ত করেছে?? সহজ উত্তর__নারীপুরুষ অবৈধ সম্পর্ক যেটা ইসলাম হারাম করার পরও তারা মানতে চায়না! ইসলাম সেই জীবন ব্যবস্থা যা মানুষকে নৈতিকতা আর মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়! মানুষকে নিজের শরীর আর মনের নিরাপত্তা দান করে! আর তাই ইসলামে নিজের শরীর আর মনের নিরাপত্তা এসেছে পবিত্র বিয়ের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন...

"আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের (মানব জাতির) মধ্য থেকেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য (বিপরীত লিঙ্গের) জুড়ি, যাতে করে তোমরা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো! এ উদ্দেশ্যে তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন হৃদ্যতা-বন্ধুতা আর দয়া-অনুগ্রহ অনুকম্পা। এতে রয়েছে বিপুল নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্য" [৩০:২১]

সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন বিবাহের মাধ্যমেই নারী পুরুষ পাবে প্রশান্তি, সৃষ্টি হবে হৃদ্যতা-বন্ধুতা, দয়া অনুগ্রহ অনুকম্পা! আর এটা চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ! কিন্তু আমরা কেউ চিন্তাশীল নই! আমরা মানুষের হারাম সম্পর্ক দেখে স্বপ্নের বীজ বুনি! হলিউড-বলিউড তারকাদের "রিলেশনশিপ উইথ অমুক" দেখে ভাবি হ্যাঁ "আমারও চাই"!! সেলিনা-বিবার, এঞ্জলিনা-ব্র্যাড পিট লিভ টুগেদার দেখে ভাবি, "আহা! তারা কতই না সুখে আছে! কেন যে ইসলামে এসব হারাম করল বুঝি না!!" এসব আধুনিকতার art of living এর রঙিন পর্দাটাই আমরা শুধু দেখি! পর্দার আড়ালের কঙ্কালসার, কুড়ে কুড়ে ধ্বংস হওয়া জীবনবোধের গল্প আমরা কেউ জানিনা! আসুন কয়েকটা গল্প শুনি.....

শুধু আমেরিকাতেই একজন পুরুষ বিয়ের আগে গড়ে ৮ জন নারীর সাথে সম্পর্কে জড়ায়! তাদের সবার সাথেই অবাধ যৌনসম্পর্ক থাকে। এরপর সে একটা বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারে। এবং বিয়ের পরও দুই তিনটা অবৈধ যৌনসম্পর্ক থাকে একজন আমেরিকানের। ভারতের একটি পরিসংখ্যান ব্যুরো বলছে (৮-১০ বছর আগের, জাকির নায়িকের লেকচার থেকে) শুধু মুম্বাই শহরেই ৫০% মেয়ে স্কুল জীবন শেষ করার আগেই তাদের কুমারিত্ত হারায়! এখন ২০১৩!! সেই % টা কি এখন ১০০%?? কিংবা তার কাছাকাছি??? আর যেসব তারকার প্রেমের সম্পর্ক দেখে আমাদের আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠে তাদের কিছু গল্পও নিজ থেকে খুঁজে দেখবেন, আপনার গা গুলিয়ে বমি আসবে।

বোন! হিসাবটা সোজা! মহান আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন সেখানেই কল্যাণ আর প্রশান্তি লুকায়িত আছে! আর যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা অমান্য করায় আছে এই দুনিয়ায় ক্ষতি, লাঞ্ছনা, অসম্মান আর আখিরাতেও কঠিন শাস্তি! এই অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক, মোবাইল ফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলা, একসাথে ঘুরতে যাওয়া, long drive (মতান্তরে sex drive), অন্ধকার কফি শপ!!

অতি সহজ ভালোলাগা থেকে শুরু করে দুইটা শরীর কাছাকাছি আসলে দুর্বল চিত্তের অতি স্বাভাবিক শরীরের চাহিদা চরিতার্থ করার প্রয়াস আসবেই। আপনি বা আমরা কেউই "innocent intention" এর দোহাই দিয়ে **এই চাহিদাকে** হালকা করতে পারবনা! একটি হারাম রিলেশন যেখানে আস্থা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ, প্রশান্তির চেয়ে বেশী থাকে সন্দেহ, শরীরকেন্দ্রিক ভোগবাদী চিন্তা, মানসিক উত্তেজনা আর ধীরে ধীরে আত্মিক অবক্ষয়! আমরা আমাদের চারপাশে এগুলোই দেখে এসেছি, এখনো দেখছি আর ভবিষ্যতেও দেখব! আর তাই ইসলাম দুইজন নারী পুরুষকে বিয়ের পবিত্র বন্ধনে বেঁধে তাদের শারীরিক, আত্মিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে! একজন স্ত্রী, একজন স্বামী একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আস্থা, বিশ্বাসে যে সম্পর্ক তৈরি করে সেখানেই আছে যথার্থ tranquility!! একজন গার্লফ্রেন্ড তার বয়ফ্রেন্ডের হাত ধরে যতটা অনিশ্চিয়তা নিয়ে ভাবে, "ও কি সত্যিই আমাকে ভালবাসে??" একজন স্ত্রী তার স্বামীর হাত ধরে ততটাই আস্থা আর বিশ্বাসের সাথে ভাবতে পারে, "He is mine"!!

একজন গার্লফ্রেন্ড যতটা অনিশ্চয়তা, ভয় আর আত্মসম্মানের হুমকি নিয়ে একজন বয়ফ্রেন্ডের সাথে অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের দিকে যায়, একজন স্ত্রী ঠিক ততটাই আস্থা আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভাবতে পারে তার স্বামী তার পবিত্রতার সঙ্গী, তার স্বামী তার অনাগত সন্তানের বাবা!!

ইসলাম এভাবেই সুন্দর! এভাবেই পবিত্র! এভাবেই শরীর মনের ক্ষতি রোধ করে! এভাবেই দুইজন নারী পুরুষকে একেবারে আপন করে দেয়! তার জন্য কোন হারাম সম্পর্ক দরকার পড়েনা! মিথ্যার মায়ায় সান্ত্বনা খোঁজার দরকার পড়েনা!!

[#৩] আপনার এই প্রশ্নটা আমাদের সবার জন্যই লজ্জার! কিছু ইসলামের লেভেলধারী কুপ্রবৃত্তির পূজারির কার্যকলাপের কারণে প্রতিনিয়ত ইসলামকে অপমানিত হয়! একটা কথা মনে রাখবেন, মানুষকে দিয়ে ইসলামকে বিচার করবেন না_ইসলামকে দিয়ে

মানুষকে বিচার করবেন! আমার এতক্ষণের আলোচনা থেকে নিশ্চয় আপনি এটা বুঝতে পেরেছেন যে আপনি যাদের দেখেছেন তারা নিষিদ্ধ কাজ করছে। ইসলাম নিয়ে কি জানার দরকার পড়েনা? আমরা স্কুলে বিদায় হজ্জের ভাষণ পড়েছি! যেখানে রাসুল (সাঃ) বলে গিয়েছেন, "আমি তোমাদের কাছে দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি, কোরআন আর সুন্নাহ (রাসুল (সাঃ) এর হাদিস)"! সুতরাং ইসলামে কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক আমরা তা কোরআন সুন্নাহ থেকে শিখব কোন মানুষকে দেখে নয় হোক তারা নিজেদের পরেহেজগার বলে জাহির করে!

[#8] আপনার এই প্রশ্নটা খুবই interesting! আমরা কি পছন্দের মানুষের জন্য দোয়া করতে পারব?? অবশ্যই আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারবেন যেন আপনার জোড়ার সাথে বিয়ের পবিত্রতায় আবদ্ধ হতে পারেন! আপনার জন্য নির্ধারিত মানুষটি যেন সৎ, তাকওয়াবান হয়! সে যেন আপনার হৃদয়ে প্রশান্তির বার্তা নিয়ে আসে! **But it doesn't mean that আপনি একটার পর একটা সম্পর্কে জড়াবেন আর প্রত্যেকজনকে আপনার জোড়া ভাববেন!!** নিজের নফসকে সংযত করে , নিজের প্রতি, আল্লাহর প্রতি সৎ থেকে আপনি অপেক্ষা করবেন! আপনি যদি নিজের সততা বজায় রাখতে পারেন তাহলে আশা করা যায় আপনার জোড়াও সংযম অবলম্বন করে আপনার অপেক্ষায় থাকবে। আপনি সেই পুরুষটির জন্য সততার ভিত্তিতে প্রস্তুতি নেন ইনশাআল্লাহ মানুষটিকে আল্লাহই আপনার কাছে পৌঁছে দেবেন!

Allah has already written the name of your spouse for you. What you need to work on is your relationship with ALLAH (swt). He will send him to you when you are ready. It is just a matter of time.

আর যদি চান আপনার মানুষটি সৎ আর ভাল হবে তাহলে আপনাকেও তা অর্জন করতে হবে। কারন আল্লাহ স্পষ্ট করেই বলেছেন...

“(জেনে রেখো) নষ্ট নারীরা হচ্ছে নষ্ট পুরুষের জন্য, নষ্ট পুরুষরা হচ্ছে নষ্ট নারীদের জন্য, (আবার) ভাল নারীরা হচ্ছে ভাল পুরুষদের জন্য, ভাল পুরুষরা হচ্ছে ভাল নারীদের জন্য, (মোনাফেক) লোকেরা (এদের সম্পর্কে) যা কিছু বলে তারা তা থেকে পাক পবিত্র; (আখিরাতে) এদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রেযেক” [৪:২৬]

অনেক কথা বলে ফেলেছি। অনেক কথাই আপনি জানতে চাননি আমি নিজ থেকেই বলেছি একটা পরিপূর্ণ সমাধানমূলক উত্তর দেওয়ার জন্য। হয়তো আপনি আমার সব কথা বুঝতে পেরেছেন, হয়তো বুঝতে পারেননি, হয়তো একদিন বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যেন আমাদেরকে ইসলামের সমাধান মেনে নেওয়ার আর এতে আস্থা রেখে হেফাজতে থাকার তৌফিক দিন। **আমরা যেন সাময়িক সুখ আর আবেগের কাছে এই দুনিয়া আর আখিরাতের যথার্থ প্রশান্তি নষ্ট না করি!**

সখি

শহরবাসীর কাছে সবচেয়ে বিরক্তিকর জায়গাগুলোর মধ্যে অবশ্যই বাসস্ট্যান্ড থাকবে। কখন বাস আসবে তার অপেক্ষা, বাস আসার পর কখন ছাড়বে তার অপেক্ষা, ছাড়ার পর জ্যাম পেরিয়ে বাসায় পৌঁছানোর অপেক্ষা। মানুষ অপেক্ষা ব্যাপারটাকে পছন্দ করে না। আমার কিন্তু একটুও খারাপ লাগে না এখানে থাকতে। আব্দুল্লাহপুর বাসস্ট্যান্ডে একটা লোকাল বাসের মধ্যে বসে আছি। আশেপাশে কতো বিচিত্র মানুষ। প্রতিটা মানুষ আলাদা। আলাদা তাদের জীবনের গল্পগুলো। এগুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতেই সময় কেটে যায়। এই তো সামনেই তেল চপচপে চুলে সিঁথি করা এক ছেলে ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। পড়াশুনা করতে দূরে কোথাও যাবে হয়তো। এক মহিলা একটু পরপরই ওকে জড়িয়ে ধরছেন। রাজ্যের উপদেশ দিচ্ছেন। বোঝাই যাচ্ছে ছেলেটার মা। লোকাল বাসস্ট্যান্ডে অস্থির মুখে এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। বাসায় যাবার তাড়া আছে হয়তো। বাসায় কী দেরিতে গেলে কেউ রাগ করে বসে থাকে? সামান্য দূরেই মধ্যবয়স্ক এক লোক একটু পরপর প্যান্টের পকেটে হাত দিচ্ছেন। বেতন পেয়েছেন হয়তো। বারবার পকেটে হাত দিয়ে দেখছেন টাকাগুলো পকেটে আছে কিনা! ছেলেমেয়েদের টিউশনের টাকা দিতে হবে। এতোগুলো টাকা হারালে বিপদ।

- "এতো মন খারাপ করে বসে আছো যে? বৌ মরে গেছে নাকি?"

মানুষের চিন্তা করতে করতে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলাম নিজেও জানি না। আমার বয়সী এক মেয়ে কণ্ঠের শব্দে সম্বিত ফিরে পেলাম। মেয়েমানুষ হয়ে আমার মতো হুজুরের পাশে বসেছে? তাও এমন ফ্রেণ্ডলি গলায় কথা বলছে! পাশ ফিরে দেখি জয়া। আমার ছেলেবেলার ক্লাসমেট। ক্লাস ফাইভ থেকে একসাথে পড়েছি। খুব মেধাবী ছাত্রী ছিল। সবসময়ই ফার্স্ট-সেকেণ্ড হতো। ধবধবে সাদা শাড়ি পরেছে ও। কপালে লাল টিপ। ঠোঁটে কড়া করে লাল লিপিস্টিক। দাঁত বের করে এতো সুন্দর করে হাসছে!

তাও চেহারার বেহাল দশা ঢাকতে পারছে না। ছোটবেলা থেকেই ওর স্বাস্থ্য ভালো ছিল বলে সবাই ওকে কতো খেপাতো। এখন অনেক শুকিয়ে গেছে। চোখে কালিও পরে গেছে। চোখ দেখেই বোঝা যায়, প্রচুর কান্নাকাটি করে ও। কতো রাত ঘুমায় না কে জানে!

আমি দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলাম। ছিঃ! বেপর্দা একটা মেয়ের দিকে এতোক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম!

- "কী জবাব দিলে না যে? ফেইসবুকে দেখি লেখালিখি করে ভাসায়া ফেলো। একবার মুমিন হলে জীবনে কোন দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। আত্মসমর্পনেই নাকি শান্তি! তাহলে এখন মুখ কালো করে বসে আছো কেন?"

আমি বিব্রত হয়ে বাসের চারদিকে তাকালাম। বেশ ক'জন মানুষ আমার দিকে সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। পাঞ্জাবী পরা দাঁড়িওয়ালা ছেলের সাথে এমন মেয়ের বসে থাকাকে তারা মিলাতে পারছে না। বাস লোকে ভর্তি। উঠে যাব নাকি?

- "বুঝলাম তাকানো তোমার ইসলামে জায়েজ না। কথাও কি বলা যাবে না নাকি?"

আমি শান্ত গলায় থেমে থেমে বললাম,

"আমি কোথাও লিখিনি মুমিন হলে জীবনে দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। দুঃখ-কষ্ট তো আসবেই। আসবে কঠিন কিছু পরিক্ষা। কিন্তু আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দিলে কোথা থেকে যেন দানবীয় শক্তি আসবে সেই কষ্টগুলোর মুখোমুখি হবার। বিপদে ধৈর্য ধরার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম বলেছেন, "মুমিনের ব্যাপারটা খুবই আজব। যখন তার সাথে ভালো কিছু ঘটে, তখন সে কৃতজ্ঞ হয় আর এটাই তার জন্য

উত্তম। আর যখন তার কোনো ক্ষতি হয়, তখন সে সবর করে আর এটাও তার জন্য উত্তম।”

- “হুম তোমাদের মুমিনদের এই একটা সুবিধা। ভালো কিছু হলে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলো আর খারাপ কিছু হলে ‘এটা একটা পরিক্ষা’ - বলে পার পেতে চাও।”

- “বরং আমাদের জীবন তোমাদের মতো প্যাথেটিক না যে জীবনে হতাশা আসলে নিরাশ হয়ে যাব। আমাদের মন খারাপের রাতে আমরা আল্লাহর সাথে কথা বলি। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই কিংবা একটার পর একটা গান শোনার চেয়ে এটা হাজার গুণে ভালো। এগুলো তো খালি হতাশাই বাড়ায়। দুই জগতের বাসিন্দা হিসেবে আমার এটা জানা আছে।”

আগের মতোই হাসি-খুশি গলায় জয়া বলল, “বাব্বা! হুজুর হয়েছো। কিন্তু পিন মেরে কথা বলার অভ্যাস দেখি এখনো ছাড়তে পারোনি। আমার অবশ্য হুজুর দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে। তোমাকে অবশ্য খুব একটা খারাপ লাগছে না। দাঁড়িতে তোমাকে ভালোই মানিয়েছে। তোমার প্রতি ছোটকাল থেকে একটা ভালো লাগা ছিল বলেই হয়তো এমনটা মনে হচ্ছে। তোমার নাকে কী হয়েছে? চশমা পরতে পরতে কি দাগ বসিয়ে ফেলেছো?”

আমার ইচ্ছা হলো কড়া গলায় বলি, “দ্যাটস নান অফ ইউর বিজনেস! প্লীজ এক্সকিউজ মি।”

অনেক কষ্টে নিজেকে চেক দিলাম। ঝাঁঝালো গলায় বললাম, “তুমি কি একটু সরে বসবে? আমার অস্বস্তি লাগছে।”

অন্য যে কোন মেয়ে হলে অপমানে কালো হয়ে যেতো। কিন্তু ও একটুও ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, “তোমার এই স্পর্শ-জড়তা আমার কাছে নতুন কিছু না। মনে আছে, একবার চকলেট দেয়ার সময় যাতে আমার হাতে টাচ না লাগে এ জন্য তুমি এতো

অদ্ভুতভাবে চকলেট দিচ্ছিলে যে চকলেট শেষমেশ তোমার হাত থেকেই পড়ে গেলো। প্রথমে ভাবলাম শুধু আমার সাথেই মনে হয় তুমি এমন করো। পরে দেখি, সব মেয়েকেই তুমি চর্মরোগী ভাব। মানুষজন মেয়ে লোকের স্পর্শ নেয়ার জন্য কী না করে! আর তুমি? জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি, কেমন আছো?"

আমি ঠিক করলাম ওর কোন কথারই আর জবাব দেবো না। বলুক যা ইচ্ছা!

- "কি হলো আগের মতো এখনো এয়ারপ্লেন মোডে চলে গেছো নাকি? কথা বলো না কেন? বলো বলো বলো.....। তুমি কথা না বললে আমি আরো জোরে বলব। বলো বলো বলো.....।"

বাসের অধিকাংশ মানুষ তামাশা দেখছে। একজন বৃদ্ধ বিরক্ত হয়ে বারবার মাথা ঘুরিয়ে দেখছেন। কী মুশকিল! আমি নীচু গলায় বললাম, "প্লীজ! আমাকে বিব্রত করো না। মানুষজন দেখছে। আমার প্রচণ্ড লজ্জা লাগছে।"

এবার ও প্রচণ্ড রেগে গেলো। রেগে গেলে ওর ঠোঁট ছোট হয়ে যায়। ঝাঁঝালো গলায় বলল, "হ্যাঁ! তোমার কাছে তো লোকে কী বলে ঐটাই ইম্পর্ট্যান্ট। একসময় ভাবতাম, মানুষের জন্যই হয়তো তুমি আমাকে রিজেক্ট করে দিয়েছো। আমি দেখতে সুন্দর না। তোমার সাথে যায় না। কতো চেষ্টা করলাম। কতো কিছু করলাম। তোমার মন পাওয়া গেলো না"।

- "জয়া! তোমাকে আগেও বলেছি চেহারা আমার কাছে ইম্পর্ট্যান্ট কিছু না। তোমার লিবারেল মেন্টালিটি আমার ভালো লাগে না। আমি ছেলেবেলা থেকেই ধার্মিক না হলেও যথেষ্ট কনজার্ভেটিভ। আর তোমাকে না করেছি কেন জিজ্ঞেস করলে? আজ তোমার জীবন আর আমার জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখো না একবার। কতো আলাদা জীবন, কতো আলাদা পথ!"

জয়া সিরিয়াস গলায় বলল, “ধরো! আমি যদি এখন ধার্মিক হয়ে যাই, তাহলে কি তুমি আমায় বিয়ে করবে?”

আমি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললাম, “প্রশ্নই আসছে না। কারণ, তোমার ঐ ধার্মিকতা আল্লাহর জন্য হবে না। আমার জন্য হবে। আর মানুষের জন্য যা কিছু করা হয় তা তো একদিন ফিকে হয়ে যাবে।”

- “আচ্ছা মন থেকেই যদি ইসলাম কবুল করি?”
- “যেদিন সত্যিই মন থেকে ইসলাম কবুল করবে সেদিন নিজের অতীতের জন্য অনুতপ্ত হবে। এসব ফালতু প্রশ্ন মাথায় আসবে না। বাস চেরাগআলী এসে গেছে। তোমার নেমে যাওয়া উচিত”

জয়া ধরা গলায় বলল, “আচ্ছা নেমে যাবো। আর কোনদিন তোমার সামনে এসে দাঁড়াব না। তোমায় বিরক্ত করব না। শুধু একবার বলো, তুমি কি আমায় ভালোবাসতে? প্লীজ একবার বলো। ভালোবাসতে? সত্যি বললে তো আর তোমার আল্লাহ রাগ করবেন না”

আমি বিব্রত হয়ে ওর দিকে তাকালাম। চোখ ভাসিয়ে ও কাঁদছে। কাজলে দু’চোখ লেপ্টে আছে।

- “আমার জানামতে তোমার একজন বয়ফ্রেণ্ড আছে। আমাকে এসব জিজ্ঞেস করার কি কোন অর্থ আছে?”

- “একবার না হয় নিরর্থক প্রশ্নেরই উত্তর দিলে। বলো না প্লীজ! শেষবার আমার অনুরোধটা রাখো। ভালোবাসতে?”
জয়া আমার হাত ধরতে চাইলো। আমি দ্রুত সিট থেকে উঠে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। যথেষ্ট নাটক হয়েছে।

একটু পরেই একজন আমাকে ধাক্কা দিয়ে বাস থেকে নেমে গেলো। জয়া! দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাস্তা পার হচ্ছে। সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটা আরেকটু হলেই একটা বাসের নীচে পড়ে যেতো। আমি ক্লান্ত হয়ে আবার সীটে বসে পড়লাম। বাস চৌরাস্তা পার হয়ে জয়দেবপুরের দিকে যাচ্ছে। আমার গন্তব্য বহু আগেই পার হয়ে গেছি। তবুও নামতে ইচ্ছা করছে না। অতীতের কথাগুলো অনেকদিন পর চোখে ভাসছে।

আমার জীবনে প্রথম লাভ-লেটার আমি ক্লাস এইটে পাই। আমার অপরিপক্কতার কারণেই অনেক ক্লাসমেট ব্যাপারটা জেনে গিয়েছিল। সবাই ব্যাপারটাতে খুব মজা পেতো। ভাবতো, আমি বুঝি ওকে পছন্দ করি। কাণ্ড দেখো! এই ছেলে কিনা এমন মেয়ের প্রেমে পড়েছে! অথচ কাহিনী ছিল একদম উল্টো। আমি ভদ্রভাবেই না করে দিলাম। কলেজে আবার ও আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলো। এবার ফোনে। বলল, "পছন্দ করো না ঠিক আছে, বন্ধু হতে দোষ আছে?" ভাবলাম, তাই তো! বন্ধু তো হওয়াই যায়। সে বন্ধুত্ব যে কোথায় আমায় নিয়ে যাবে তা কে জানতো? ওকে 'হ্যাঁ' বলে দিবো, এমন সময় ওর সাথে আমার ক্লাসমেট মাহফুজের রিলেশন হয়ে গেলো। নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। তবে ফোনে টুকটাক কথা ঠিকই চলতো। কলেজ জীবনের শেষে আল্লাহ তা'য়ালা হেদায়েত দিলেন। হালাল-হারামের জ্ঞান দিলেন। জীবনের উদ্দেশ্যটা জানালেন। ওকে সরাসরি বললাম, "তোমার সাথে কথা বলা ঠিক হবে না আর। আমি স্রষ্টার কাছে নিজেকে সঁপে দিবো ইন শা আল্লাহ। তুমিও তাই করো"। ও উল্টো বুঝলো। ভাবলো আমি হয়তো আর যোগাযোগ রাখতে চাচ্ছি না। আমাকে বলল, "তোমার এই ধার্মিকতা বেশিদিন থাকবে না। নাকি অজুহাত দিচ্ছ? বললেই হয় আমার সাথে কথা বলবে না।"

কলেজ শেষ হলো। ভার্সিটিতে প্রবেশ করলাম। আমি আমার জীবনের সিদ্ধান্তগুলো নিলাম, ও ওর জীবনের। ডিসিশানগুলো ছোট ছোট। কিন্তু ছোট ছোট এই

সিদ্ধান্তগুলোই অনেক বড় পরিবর্তনের সূচনা করে দিলো। ঠিক করে দিলো, জীবনের বাকীটা পথ আমরা কে কোন পথে হাঁটব! এরপরেও শয়তানের ওয়াসওয়াসাতে মাঝে মাঝে ওকে দাওয়াহ দেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু নিজেরই বিপথে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে। তারপর অনেক দিন বিচ্ছিন্ন। দেখা নেই, কথা নেই। প্রায় ৩ বছর পর আজ দেখা হলো।

আমার হঠাৎ করেই ইচ্ছা করলো বাস থেকে নেমে ওর কাছে যাই। বলি, "এই মেয়ে অনেক জ্বালিয়েছো আমাকে। যাও আংকেল-আন্টিকে রাজী করাও। আজই বিয়ে করে ফেলবো তোমাকে। বিয়ের পর কিন্তু এমন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে চলতে পারবে না। লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকবে, ঠিক আছে? আর হিন্দুদের মতো লাল টিপ পরে আছো কেন? জানো মিশরে কারা টিপ পরতো? ফাজিল মেয়ে!" আল্লাহ তায়ালা আমাদের কল্পনাতে কোন বাঁধ দেননি। আমরা চাইলেই অনেক কিছু কল্পনা করতে পারি। সে কল্পনায় জয়ার সাথে আমার বিয়ে হয়ে যায়। কোন এক শীতের রাতে ও আমার জন্য চা বানিয়ে নিয়ে আসে।

- "এ কী দাত-মুখ কুঁচকে চা খাচ্ছ কেন? চায়ে চিনি হয়নি? ইয়া আল্লাহ! চিনি তো দেইইনি।"

- "চিনি দিতে হবে না। তুমি তোমার আঙ্গুলটা ভিজিয়ে দাও চায়ে। এমনি চা মিষ্টি হয়ে যাবে।"

ও লজ্জায় লাল হয়ে বলে, "যাও! তোমার যা ঢঙ!"

কল্পনায় লাগাম দিতে হলো। যে মেয়ে আমার জন্য বৈধ না, তাকে নিয়ে এতো চিন্তা কেন করছি! আউযুবিল্লাহ! আল্লাহ তা'য়ালা তো সবই দেখছেন। কতোবার ওকে

মেসেজ দিতে গিয়ে আমি নিজের হাত সরিয়ে নিয়েছি তা তিনি দেখেছেন। আজ যখন ওকে খুব বলতে ইচ্ছা হচ্ছিলো, "হ্যাঁ! সত্যিই তোমাকে অনেক ভালোবাসতাম"।

তখন নিজের আবেগকে লাগাম পরিয়েছি। সেটাও তিনি জানেন। আমার দু'চোখের অশ্রু, ফিরে আসার দু'আ-সবই তো তিনি শুনেছেন। দেখেছেন। প্রতিটা মুহূর্ত যেন নিজের সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে আছি। সালাফরা বলতেন, 'আমাদের মন কখনো অলস থাকে না। মন যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে সরে আসে, তখন তা অন্য কারো স্মরণে নিয়োজিত হয়ে যায়। তখনই সে মন প্রেমে পড়ে'। আমি তো চেষ্টা করি, তারপরেও ভুল হয়ে যায়। 'নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ, তবে সে নয় যার প্রতি আমার রব অনুগ্রহ করেন। আমার রব বড়ই দয়ালু, বড়ই ক্ষমাশীল'।

বাস ছুটে যাচ্ছে। মন চাচ্ছে অনন্তকাল বাসে বসে থাকতে। না পাওয়া জীবনের হিসাব মিলাতে। প্রচণ্ড বিষন্ন লাগছে। একটা সময় ছিল যখন বিষন্ন লাগলে কবিতা আওড়াতাম-

"জানি আমার কঠিন হৃদয়
চরণ রাখার যোগ্য সে নয় -
সখা, তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায়
তবু কি প্রাণ গলবে না?
না হয় আমার নাই সাধনা,
ঝরলে তোমার কৃপার কণা
তখন নিমেষে কি ফুটবে না ফুল
চকিতে ফল ফলবে না।
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চলবে না।"

এখন অবশ্য অন্যভাবে বিষন্নতা দূরা করার চেষ্টা করি। বিষন্নতা দূর করার দু'আটা মনে মনে আওড়ালাম – "আল্লাহুম্মা ইন্নি আবদুক, ইবনু আবদিক, ইবনু আমাতিক, না সিয়াতী বিয়াদিক, মা-দ্বিন ফিয়্যা হুকমুক, 'আদালুন ফিয়্যা ক্বাদায়ুক....."

- "আল্লাহ গো! আমি তো তোমার দাস। তোমারই দাসের পুত্র। তোমার দাসীর পুত্র। আমার কপাল তোমার হাতে। আমার উপর তোমার নির্দেশ অবশ্যই বাস্তবায়ন হবে। আর তুমি আমার ব্যাপারে যে ফয়সালাই দাও না কেন সেটাই সঠিক। আল্লাহ গো! তুমি কুর'আনকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের প্রশান্তি, বক্ষের জ্যোতি। আমার বিষন্নতার অপসারণকারী। আমার দুঃখ দূরকারী।"

শেষ বিকেলের সূর্য ডুবে গেছে। চারদিক থেকে ভেসে আসছে আজানের শব্দ। আমি বাস থেকে নেমে গেলাম। মন তো অনেক কাছেই চাবে। নিজের ইচ্ছার গোলামী না করে আমার রবের গোলামী করি বলেই তো আমি মুসলিম।

জীবনটা তো আর জান্নাত না। সব ইচ্ছা পূরণ হতে হবে তাই বা কে বলেছে?

বারসিসা

বারসিসা ছিল বনী ঈসরাইলের একজন সুখ্যাত উপাসক, ধর্মযাজক, 'আবিদ'। তার নিজের মন্দির ছিল আর সেখানে সে একাগ্রভাবে নিজেকে উপাসনায় নিয়োগ করত।

বনী ঈসরাইলের তিনজন পুরুষ জিহাদে যেতে চাচ্ছিল, তাদের একমাত্র বোনকে কোথায় রেখে যাবে বুঝতে পারছিল না। তারা সবাইকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'কোথায় আমরা আমাদের বোনকে রেখে যেতে পারি? তাকে তো আমরা একা ফেলে যেতে পারিনা। কোথায় তাকে রেখে যাওয়া যায়?' তখন তারা তাদেরকে বলল, 'তাকে রেখে যাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হবে তাকে ঐ উপাসকের কাছে রেখে যাওয়া, সেই-ই সবচেয়ে ধার্মিক ব্যক্তি, আর সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য। তোমাদের বোনকে তার কাছে রেখে যাও, সে তার খেয়াল রাখবে'। তারা আবিদের নিকট গেল। তাকে সব বর্ণনা করে বলল, 'এই হল অবস্থা - আমরা জিহাদে যেতে চাই, আপনি কি কষ্ট করে আমাদের বোনকে দেখে রাখতে পারবেন?' সে বলল, 'আমি তোমাদের থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আমার কাছ থেকে চলে যাও'।

তখন শয়তান তাকে প্রলুব্ধ করল, 'তুমি তাকে কার কাছে রেখে আসবে? তুমি যদি তার খেয়াল না রাখো তাহলে হয়ত কোন দুষ্ট লোক তার খেয়াল রাখবে, আর তারপর তো তুমি জানোই কী ঘটবে! তুমি কি করে এই ভাল কাজটা তোমার হাতছাড়া করে দিতে পার?'

দেখুন! শয়তান তাকে ভাল কাজে উৎসাহিত করছে! তো সে তাদেরকে আবার ডেকে এনে বলল, 'ঠিক আছে, আমি তার খেয়াল রাখব, কিন্তু সে আমার সাথে আমার মন্দিরে থাকতে পারবে না, আমার আরেকটা বাড়ি আছে সে সেই ঘরে থাকবে'।
সে মেয়েটিকে বলল, 'তুমি ওখানে থাক, আমি আমার মন্দিরে থাকব'।

তো মেয়েটা সেই বাড়িতে একটা ঘরে থাকত, আর সেই ধর্মযাজক তার জন্য প্রতিদিন খাবার নিয়ে এসে তার নিজের দরজার বাইরে রেখে দিত। সে মেয়েটির বাড়িতে পর্যন্ত যেত না, নিজের দরজার বাইরেই খাবার রেখে দিত আর মেয়েটিকে ঘর থেকে বের হয়ে এসে খাবার নিয়ে যেতে হত; সে মেয়েটির দিতে তাকিয়ে দেখতে পর্যন্ত ও চাইত না।

তখন শয়তান আবার তার কাছে এসে বলল, 'তুমি করছটা কি? তুমি কি জানো না মেয়েটা যখন তার ঘর থেকে বের হবে আর তোমার মন্দির পর্যন্ত আসবে লোকে তাকে দেখতে পাবে? তোমার উচিত তার দরজায় যেয়ে খাবারটা রেখে আসা'। 'সে বলল, 'হ্যাঁ, আসলেই'।

শয়তান কিন্তু তার সাথে সামনা-সামনি কথা বলছেনা, তাকে ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। ধর্মযাজক 'আবিদ তাই এবার খাবার নিয়ে মেয়েটির দরজা পর্যন্ত রেখে আসতে শুরু করল।

এভাবে কিছুদিন চলল, এরপর শয়তান তাকে বলল, 'মেয়েটা এখনও তার দরজা খুলছে আর বাইরে বের হয়ে আসছে প্লেট নেয়ার জন্য, কেউ তাকে দেখে ফেলতে পারে, তোমার উচিত প্লেটটা তার ঘরে গিয়ে দিয়ে আসা'। শয়তান কিনা তাকে বলছে আরো ভাল কাজ করতে! তাই সে খাবারের প্লেটটা ঘরে রাখা আরম্ভ করল, সেখানে রেখেই সে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসত। এভাবে আরো কিছুদিন পার হলো। আর ওদিকে জিহাদ চলতে থাকায় ভাইদের ফিরে আসতে বিলম্ব হচ্ছিল।

শয়তান আবারো তার কাছে আসলো, বলল, 'আচ্ছা, তুমি তাকে এভাবে একা ছেড়ে দিবে, কেউ তো নেই যে তার দিকে একটু খেয়াল রাখবে, একটু কথা বলবে। সে যেন জেলখানায় আবদ্ধ হয়ে আছে, কথা বলার কেউ নেই। তুমি কেন ওর দায়িত্ব নিচ্ছ না? ওর সাথে একটু সামাজিকতা বজায় রেখে তো চলতে পারো, গিয়ে একটু কথা বলো

যাতে করে তুমি তার খোঁজখবর রাখতে পারো। তা না হলে দেখা যাবে সে বাইরে যেয়ে কোন পরপুরুষের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়বে'। তাই সে মেয়েটির সাথে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুরু করলো, মেয়েটা ঘরের মধ্য থেকেই কথা বলত; দুজনকে প্রায় চিৎকার করে কথা বলতে হতো যেন তারা একজন অন্য জনকে শুনতে পায়।

শয়তান এবার তাকে বলল, 'তুমি এরকম দূর থেকে একজন আরেকজনের উপর চিৎকার না করে কেন ব্যাপারটাকে নিজের জন্য আরেকটু সুবিধাজনক করে নিচ্ছোনা? কেন তার সাথে একই ঘরে বসে কথা বলছ না?' তো এবার সে মেয়েটার সাথে একই ঘরে বসে কিছুসময় ব্যয় করতে শুরু করল। তারপর ধীরে ধীরে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসাথে কাটাতে লাগল, আর আস্তে আস্তে তারা পরস্পরের আরো কাছাকাছি আসতে লাগল। এক সময় এমন হল যখন সেই আবিদ, ধর্মযাজক, উপাসক সেই মেয়ের সাথে যিনায়(ব্যাভিচার) লিপ্ত হল। ফলে মেয়েটা অন্তসত্ত্বা হয়ে পড়ল।

কাহিনী এখানেই শেষ নয়। মেয়েটি একটি সন্তানের জন্ম দিল। শয়তান ধর্মযাজকের কাছে এসে বলল, 'একি করেছ তুমি! তুমি কি জানো যখন ওর ভাইরা ফিরে আসবে তখন কি হবে? তারা তোমাকে মেরে ফেলবে, এমনকি তুমি যদি এটাও বলো যে – "এটা আমার বাচ্চা না", তারা তোমাকে বলবে যে "তোমার বাচ্চা না হলেও তুমি তার দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলে, তাই এটা এখন তোমারই দায়ভার। বাচ্চার বাবা কে আমরা তার পরোয়া করি না, তুমিই এর জন্য দায়ী"। সুতরাং এখন একটাই উপায়, তুমি বাচ্চাটাকে মেরে তাকে পুঁতে ফেল'। বারসিসা বলল, 'এটা কি গোপন থাকবে আমি তার ছেলেকে মেরে ফেলার পরে?' শয়তান বলল, 'তোমার কি মনেহয় ও এটাকে গোপনে রাখবে? তুমি যদি এরকম ভাব, তাহলে তুমি মস্ত বড় বোকা'। সে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে আমি কি করব?'। শয়তান জবাব দিল, 'তোমার ঐ মেয়েটাকেও মেরে

ফেলা উচিত'। তাই সে মেয়েটাকে আর বাচ্চাকে মেরে ফেলল, এরপর দুজনকে একই ঘরের নিচে কবর দিয়ে দিল।

ভাইয়েরা একসময় ফিরে আসল, তারপর জানতে চাইল, 'আমাদের বোন কোথায়?', সে উত্তরে বলল, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এরপর মারা যায়, তাকে ওখানে কবর দেয়া হয়েছে' এই বলে সে মনগড়া একটা কবর দেখিয়ে দিল তাদেরকে। তারা বলে উঠল, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহিরাজি'উন', তারা বোনের জন্য দু'আ করলো, আর নিজেদের বাসায় ফিরে গেল।

রাতের বেলা, তিনজনের মাঝে এক ভাই একটা স্বপ্ন দেখলো, কে তার সেই স্বপ্নে এসেছিল? শয়তান! সে তাকে বলল, 'তুমি বারসিসা কে বিশ্বাস করো? তুমি কি তাকে বিশ্বাস করো? সে মিথ্যা বলেছে। সে তোমার বোনের সাথে ব্যাভিচার করেছে, তারপর তাকে আর তার ছেলেকে মেরে ফেলেছে। আর এই কথার প্রমাণ হল সে তোমাদেরকে যেখানে কবর দেখিয়েছে তোমাদের বোন সেখানে নেই, আছে তার ঘরের পাথরের নিচে'। তার ঘুমভেঙ্গে গেল আর সে তার বাকি ভাইদেরকে স্বপ্নের কথা জানালো। তারা বলল, 'আমরাও তো একই স্বপ্নই দেখেছি, তাহলে এটা নিশ্চয়ই সত্যি'। পরদিন তারা সেই মিথ্যা কবরটা খুড়ল কিন্তু কিছুই পেল না, এরপর তারা তাদের বোনের ঘরে গিয়ে মাটি সরাল তখন দেখতে পেল তার বোনের মৃতদেহ সাথে একটা শিশু। তারা যেয়ে বারসিসাকে ধরল, 'মিথ্যুক! এইসব করেছ তুমি?' তারা তাকে ধরে টেনে হিঁচড়ে রাজার কাছে নিয়ে গেল।

এমন সময় শয়তান আসল বারসিসার কাছে, এবারে কিন্তু সে মনের ওয়াসওয়াসা হিসেবে আসেনি, **সে আসল মানুষের রূপ ধরে।** তাকে বলল, 'বারসিসা, তুমি কি জানো আমি কে? আমি শয়তান, আমিই সে, যে তোমাকে এতো ঝামেলার মধ্যে ফেলেছি। আর আমিই সে একজন, যে তোমাকে এখন এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবো।

আমিই এসব ঘটনা ঘটিয়েছি আর আমার কাছেই আছে এসবের সমাধান। এখন তোমার উপর নির্ভর করে, তুমি যদি মরতে চাও তো ঠিক আছে। তুমি যদি চাও আমি তোমাকে রক্ষা করি, তাহলে আমি করতে পারি'। বারসিসা বলল, 'দয়া করে আমাকে বাঁচাও'। শয়তান বলল, "**আমাকে সিজদাহ করো**"। বারসিসা শয়তানের প্রতি সিজদাহ করল। কিন্তু শয়তান কি বললো? সে বললো, 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, তোমার সাথে দেখা হয়ে ভাল লাগল'। এরপর সে তাকে আর কোনদিন দেখতে পেল না। বারসিসা শয়তানের উদ্দেশ্যে সিজদাহ করলো, আর এটাই ছিল তার **জীবনে করা শেষ কাজ**, কারণ এর কিছুক্ষণ পরেই তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। সুতরাং তার জীবনের শেষ কাজটা তাহলে ছিল-শয়তানকে সিজদাহ করা, সে ছিল সেই উপাসক যে কিনা ছিল সরল পথের উপর, কিন্তু যেহেতু সে সেপথ থেকে বাঁক নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যদিও খুব খুব ছোট্ট একটা বাঁক, প্রথমদিকে যেটাকে একেবারেই তুচ্ছ মনে হচ্ছিল, একটু সুবিধার নামে, দ্বীনের মাসলাহার নামেই সে এগুলো করেছিল। সরলপথ থেকে তার বিচ্যুতির পরিমাপটা ছিল একদমই নগণ্য কিন্তু দেখুন তার শেষ পরিণতি! নিজের ইচ্ছাকে অনুসরণ করার বিপত্তিটা এখানেই; আমরা আমাদের জ্ঞান, কোরআনের যতখানি জানি, আমাদের ইবাদত ইত্যাদি নিয়ে বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে যাই। সুবহানাল্লাহ! আমাদের তো সব সময় উচিত নিজেদের নিয়ে শঙ্কায় থাকা, আমরা কখনই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হবো না বরং আমাদের সব সময় উদ্বিগ্ন থাকতে হবে, আর এটাই হল আল্লাহ-ভীতি, এটাই সত্যিকার অর্থে 'জ্ঞান'। আল্লাহ বলেন,

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে" [৩৫:২৮]

আসুন এবার আমরা দেখি বারসিসার এই কাহিনী থেকে আমাদের জন্য কি কি রয়েছে।

১। প্রথমেই খেয়াল করে দেখুন শয়তান বারসিসার সাথে কোন নীতি গ্রহণ করেছিল? যদি শয়তান বারসিসার কাছে এসে সরাসরি বলত, 'আমাকে সিজদাহ করো' বারসিসা কি কখনো তা করত? না, করত না। শয়তান step by step 'ধাপে ধাপে' মানুষকে দ্বীন থেকে বিমুখ করার নীতি গ্রহণ করেছিল। শয়তানের কাজই হল এটা যে সে সারাজীবন আপনার আমার পেছনে লেগে থাকবে এবং তার জীবনের **একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে বিভ্রান্ত করা**, ঈমান থেকে বিচ্যুত করে মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত করা। সুবাহানাল্লাহ বারসিসার করুণ পরিণতি থেকে আমরা সেটা উপলব্ধি করতে পারি! এখানে ইমাম আহমেদের মৃত্যুর সময়টার কথা বলা যেতে পারে। আবদুল্লাহ ইবন ইমাম আহমেদ বলেন, তার পিতা যখন অবচেতন পর্যায়ে পৌঁছে যান আর বলতে থাকেন, 'লা বা'আদ, লা বা'আদ' – 'না এখনও নয়, না এখনও নয়'। একথা শুনে আবদুল্লাহ প্রচন্ড চিন্তিত বোধ করলেন! চিন্তা করে দেখুন, আপনি যদি আপনার বাবাকে তার মৃত্যুকালীন সময়ে বলতে শুনেন, 'না এখনও না, না এখনও না', আপনি কিভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করবেন? এটার অর্থ কী বলে আপনার কাছে মনে হবে? 'না এখনও না, আমি এখনও মরতে চাইনা' এমনই মনে হওয়ার কথা, তাইনা?

তো ইমাম আহমেদ জেগে উঠলে, আবদুল্লাহ উদ্বিগ্ন হয়ে পিতাকে জিজ্ঞেস করল, 'হে আমার পিতা, কেন আপনি বলছিলেন – "এখনও না, এখনও না"?' ইমাম আহমেদ বললেন, 'শয়তান আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে তার অঙ্গুলি কামড়ে বলছিল, "হে আহমেদ, তুমিতো আমার হাত ফসকে বের হয়ে গেলে! হে আহমেদ, তুমি তো আমার হাত ফসকে বের হয়ে গেলে"! তাই আমি তাকে বলছিলাম, "না, এখনও না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি মারা যাচ্ছি। তোমার আর আমার যুদ্ধ এখনও চলছে, যখন আমি মারা যাব, একমাত্র তখনই আমি তোমার হাত থেকে রক্ষা পাব"।'

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'এরকম হওয়ার কারণটা হলো এই যে, শয়তান বুঝতে পারে আপনার সাথে এটাই তার **শেষ সুযোগ**, যদি এবার আপনি তার হাত থেকে ছুটে

যান তো আপনি চিরকালের জন্যই তার কাছ থেকে পার পেয়ে গেলেন। শেষ সময়ে আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে না পারার অর্থ সে আপনাকে আর ধরতে পারল না। এজন্যই শয়তান আপনার জীবনের শেষ সময়ের দিকে বিশেষ নজর দেয় আর আপনার বিরুদ্ধে তার কাজকে আরো জোরদার করে তুলে'। সুবাহানাল্লাহ! আল্লাহ আমাদের উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুণ যে শয়তান আমাদের পেছনে কি পরিমাণ পরিশ্রম করে যাচ্ছে **শুধু** আমাদের পথভ্রষ্ট করে মৃত্যুমুখে পতিত করার জন্য।

২। খালি চোখে বারসিসার কাহিনী থেকে যে শিক্ষাটা আমাদের প্রথমে মনে আসে সেটা হল "নারী ফিতনা"। নারী ফিতনার প্রকটতা বুঝতে হলে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে কেন, রাসুল (সঃ) বলে গেছেন, "আমি আমার উম্মতের জন্য নারীর চেয়ে অধিক বড় কোন ফিতনা রেখে যাচ্ছি না"। রাসুল (সঃ) বলেছেন, 'যখন দুইজন নারী পুরুষ একাকী অবস্থান করে তাদের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে শয়তান অবস্থান করে"। শুধু তাই নয় স্বয়ং আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন, "মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে (নারীদের প্রতি)"। [৪:২৮] যখন এখানে নারীদের প্রতি দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে এটা বলা হয় তখন নলেজেবল ভাই বোনেরাও অবাক হন! কিন্তু তাফসীরে নারীর প্রতি দুর্বলতার কথাই বলা হয়েছে। এছাড়াও আল্লাহ তায়ালা সূরা আলে ইমরানের ১৪ নং আয়াতে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করা থেকে যেসব বিষয় মানুষকে বিরত রেখেছে তার কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন, "মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী..." [৩:১৪]

৩। বারসিসার এই কাহিনী থেকে আরেকটা জিনিস লক্ষণীয় সেটা হল "good intention"। আমি তো ভালোর জন্যই কাজটা করছি এই সান্ত্বনা দিয়ে শয়তান আমাদের ফাঁদে ফেলে। একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখব শয়তান বারবার বারসিসাকে মেয়েটির ভালোর জন্য ওয়াসওয়াসা দিয়েছে। তুমি এমন না করলে মেয়েটির এই হবে, তুমি তেমন না করলে মেয়েটির সেই হবে এই ওয়াসওয়াসা। এবং

বারসিসা প্রতিবার সেই ফাঁদে পা দিয়েছে আর তার ফল সে পেয়েছে অবশেষে! এই বিষয়টা খুব সূক্ষ্মভাবে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। আমাদের মধ্যে একটা কমন tendency থাকে আমরা ইসলাম পালনের চেয়ে এক ধাক্কায় দাঈ হয়ে যেতে চাই। একটু আধটু জেনে মানুষজনকে ধুমাইয়া দাওয়াহ করে বেড়াই। সেখানে শয়তানের এসব ওয়াসওয়াসা আর নারী ফিতনার বিষয়ে কোন ধারণা না থাকায় এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার।

আমরা যেটা মাথায় রাখবো দাওয়াহ'র কিছু rules and regulations আছে। নিজে জানার এবং মানার বিষয় আছে। শয়তানের ফাঁদ নিয়ে উপলব্ধির বিষয় আছে। অনেক ভাই বোনদের আমি দেখেছি তাদের ফেসবুক পোষ্টের কমেন্ট অপশন পাবলিক থাকলেও সেখানে কোন নন মাহরাম কমেন্ট করেনা। কেন?? কেন তারা সেই সুযোগটা কখনো দেন না! আপনি একটা ফান পোস্ট দিলেন। আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে নন মাহরাম না থাকলেও কমেন্ট অপশন পাবলিক থাকার কারনে নন মাহরামরা সেখানে ফান কমেন্ট করা শুরু করল! জাহেলরা যে কায়দায় কথাবার্তা বলে অবিকল সেই কায়দায় লুতুপুতু আর ইমোশনের জোয়ার! এখানে শয়তানের সাথে আপনার বোঝাপড়া! সেই নন মাহরাম ছেলে কিংবা মেয়ে একবার কমেন্ট করবে, দুইবার কমেন্ট করবে কিন্তু যখন দেখবে আপনি তাতে কোন রেসপন্সই দিচ্ছেন না তখন সে বুঝে যাবে এবং কেটে পড়বে। কিন্তু আপনি যদি তার সমান তালে রেস্পন্স করা শুরু করেন তাহলে কি ঘটনা গড়াতে থাকবে না এবং শয়তান কি আপনাদের নিয়ে খেলতে থাকবে না?

নেট জগত দিয়ে উদাহরন দিলাম মাত্র এবার এটাকে বাস্তব জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন ফলাফল এক ও অভিন্ন! আপনাকে মনে রাখতে হবে শয়তান স্বভাবতই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আপনাকে আকৃষ্ট করবে তাই শয়তান যার দিকে আপনাকে আকৃষ্ট করছে তার দিকে "দাওয়াহ'র" অজুহাত নিয়ে এগিয়ে যাবেন না! **সবাইকে**

দাওয়াহ দেওয়ার জন্য আপনি responsible নন। এটা মনে করার কোন কারন নেই যে আপনি দাওয়াহ না নিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বরং সর্বনাশটা হবে আপনি শয়তানের ফাঁদে পা দিলে। সর্বনাশ হবে আপনি ফিতনায় জড়িয়ে গেলে! শয়তানের হাতে নিজের প্রবৃত্তিকে সঁপে দেওয়ার আগে তাই খুব গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবা উচিত। সামনে তো বারসিসার কাহিনী আছেই reminder হিসেবে!

৪। সর্বশেষ একটা lesson আমরা বারসিসার কাহিনী থেকে নিতে পারি সেটা হল বৈরাগ্য বা একাকীত্বের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে। একটু চিন্তা করুন মেয়েটি যদি বারসিসার স্ত্রী হত, কিংবা বারসিসার যদি পরিবার থাকত তাহলে হয়ত শয়তান এত সুযোগ পেত না তাকে পথভ্রষ্ট করার। একটি কথা আমার খুব ভাল লাগে_আপনি একা থাকলে যা করেন সেটাই আপনার চরিত্র!

একাকীত্ব শয়তানকে খুব বেশী সুযোগ করে দেয় তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার। যে কারনে দ্বীনের পথে থাকতে চাওয়া ভাই বোনদের সবসময় একটা motivation এর মধ্যে থাকা উচিত। বারসিসার ক্ষেত্রে শয়তান এই সুযোগটা নিয়েছিল! তাকে ওয়াসওয়াসা দিয়েছিল যা বারসিসা এড়িয়ে চলতে পারেনি। একাকিত্বের সময়ের শয়তানী ওয়াসওয়াসা মানুষের তাক্বওয়ার লেভেলকেও নিচে নামিয়ে দেয় খুব সহজে। আল্লাহ ক্ষমা করুন আমাদের। আমাদের উপর রহম করুন।

শেষকথাঃ যেহেতু সবাই মূলত ইন্টারনেট জগতের সাথে বর্তমানে পরিচিত, তাই ইন্টারনেট জগতের বিভিন্ন উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে বুঝার সুবিধার্থে! একটা বিষয় ইদানীং আমাকে খুব ভাবায় সেটা হল ইসলামের ব্যাপারটা আসলে পুরোটা উপলব্ধির! যে কারনে অনেক নলেজেবল ভাই বোনকেও দেখবেন ইসলামের অনেক কিছু জানা সত্বেও আমল করার ব্যাপারে তারা উদাসীন। সেসব ভাই বোনদের জন্য আমরা দোয়া করি যাদের অর্জিত জ্ঞান তাদের জীবনবোধের কোন পরিবর্তন করতে

পারেনি। যারা কোরআন অধ্যয়ন করেছে, ইসলামের অনেক জ্ঞান অর্জন করেছে আর এই জ্ঞান জাহির করে বেড়িয়েছে কিন্তু নিজের জীবনে তার কোন reflection পড়েনি। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। আল্লাহ আমাদের ভুলগুলো শুধরে সত্যকে আঁকড়ে ধরার তৌফিক দান করুন।

বারসিসার যে কাহিনীটা বর্ণনা করলাম এটা হয়ত অনেকেই জানেন। কিন্তু হয়ত এভাবে ভেবে দেখেননি। এখান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাটুকু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশগুলোকে purify করার কাজে লাগতে পারে ইনশাআল্লাহ। ভুলকে মেনে নিয়ে তার জন্য অনুতপ্ত হয়। মানুষ আর ভুলের উপর অবিচল থেকে তার জন্য অজুহাত দেখায় শয়তান। আমরা আশরাফুল মাখলুকাত আমরা আমাদের ভুলের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব ইনশাআল্লাহ।

এই লেখায় উপলব্ধি করার মত কিছু থাকলে আল্লাহ যেন আমাদেরকে তা উপলব্ধি করার তৌফিক দেন। যেন আমাদের পাপগুলো মুছে দেন। বিগতদিনের ভুলগুলো যেন আজকের দিনের শুদ্ধতার অনুপ্রেরণা হয় ইনশাআল্লাহ! ইসলামের শিক্ষা আর উপলব্ধি যেন আমাদের জান্নাতের পথের পথিক হতে সাহায্য করে। শয়তান যেন দুর্ভাগা বারসিসার মত আমাদেরকে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামের কঠিন আগুনে নিয়ে না যায়।

সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাহায্য চাই। আল্লাহ রহম করুন। আল্লাহ ক্ষমা করুন। ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকিম, আমীন।

এ্যাডাম টিজিং

ছোটবেলায় "না-মানুষী বিশ্বকোষ" নামে একটা বই আমার খুব প্রিয় ছিল – প্রাণী জগতের মজার মজার সব তথ্য আর ছবিতে ঠাসা। সে বইয়ের একটা ছবি আমার এখনো চোখে ভাসে – এক অজগর একটা বিশাল বন বরাহকে মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছে, আস্ত। সাপ যাই খায় সেটার মাথা আগে গিলে, তারপর শরীরের আর বাকি অংশ। এখন অজগরটা গেলার সময় বুঝতে পারেনি শুকরটা এত বড়। কিছুটা গেলার পর সে এখন আর বাকি অংশটা গিলতেও পারছেনা, বেরও করতে পারছেনা – এসব ক্ষেত্রে বেশিভাগ সময় অজগরটা মারা যায়। যদি অনেক কষ্টে-সৃষ্টে সে শিকারটা গিলে ফেলতেও পারে তবুও অজগরটা খুবই অসহায় হয়ে যায়। মানুষ তাকে পিটিয়ে মারে বা অন্যান্য বড় পশু তাকে আঁচড়ে-কামড়ে শেষ করে ফেলে – সে গলায় খাবার নিয়ে অসহায় ভাবে দেখে, রা-টি কাড়তে পারেনা।

আজকাল খবরের কাগজ দেখলে এদেশকে আমার ঐ সাপের মতই লাগে। পশ্চিমা সভ্যতার শুকরটাকে আমরা হাভাতের মত মুখে ঢুকিয়েছি, গিলতে পারিনি। লাঠির বাড়ি আর হায়েনার নখের আঘাতে আমরা গোঁ-গোঁ করছি, শত্রুদের তাড়িয়ে দেয়া তো দূরে থাক চিৎকারও করতে পারছিনা।

মানুষ একটা যুক্তিবাদী প্রাণী। সে তার বিবেক-বোধ যৌক্তিকতার সাথে ব্যবহার করে পশুত্বকে দমন করে রাখে। যখন তার জৈবিক প্রবৃত্তির উপরে তার মন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে সে পশুর পর্যায়ে নেমে যায়। এখন এই নিয়ন্ত্রণ কিন্তু আপসে আসেনা। স্রষ্টা মানুষকে কিছু আচরণ শিক্ষা দিয়েছেন যা দিয়ে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। পশ্চিমা সভ্যতার সেক্যুলার শিক্ষা মানুষকে এই মূল্যবোধ শেখায় না। ফলে সমাজে তৈরি হতে থাকে পশু। বড় দুঃখ লাগে যে আমাদের সমাজপতিরা এই পশুদের

অত্যাচার থেকে হাত পেতে পশ্চিমা দাওয়াই খোঁজেন, ঘায়ে এসিড ঢেলে চামড়া পুড়িয়ে ফেলেন – অসুখ পেয়ে যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

মানুষ বায়োলজিক্যালি একটা প্রাণী। এর ক্ষুধা আছে, পিপাসা আছে, যৌন তাড়না আছে। মানুষকে স্রষ্টা এভাবেই তৈরি করেছেন। মানুষের বায়োলজিক্যাল চাহিদা যখন পূরণ না হয় তখন একটা পর্যায়ে তার মনের শাসন আর শরীর মানেনা – এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য। যেমন কোন মানুষ যদি পানিতে ডুবে যায় তখন সে সচেতনভাবে অনেকক্ষণ চেষ্টা করে নিঃশ্বাস না নিতে। কিন্তু কয়েকমিনিট পর জোর করে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখার মেকানিসমটা নষ্ট হয়ে যায়, ফুসফুস আপনাআপনি বাতাস ভরার পথ খুলে দেয়। এর ফলে ফুসফুসে পানি ঢুকে মানুষটা মারা যায়। অথচ অক্সিজেন ছাড়া মানুষ প্রায় আধঘন্টা বেঁচে থাকতে পারে!

ধরুন রংপুরের চরম মঙ্গাপীড়িত একটা গ্রাম। মানুষজন দিনে একবার খায় – তাও কচুর শিকড় সেদ্ধ, ভুসি আর আটার গোলা। আমি সপরিবারে সেখানে গেলাম প্রশাসক হয়ে। আমার পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া অনেক সম্পদ আছে, বেতন-উপরি মিলিয়েও কামাই কম না। আমার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান খাওয়া দাওয়া। আমি খাবার জন্য গরু জবাই করলাম, খাসি কাটলাম, মুরগি পটকালাম। পুকুরে জাল ফেলে ধরলাম বুড়ো রুই, বড় কাতল আর বাঘা বোয়াল। পোলাওতে এতটাই ঘি ঢালা হলো যে তার সুবাস গ্রামের শেষ প্রান্তের অন্ধ বুড়ির দরজাতেও গিয়ে কড়া নেড়ে আসলো। মজার ব্যাপার হচ্ছে রান্না আর খাওয়া-দাওয়া সবই করা হচ্ছে বাড়ির সামনের খোলা মাঠটিতে। আমি সপরিবারে খেতে বসলাম খোলা ময়দানে। মাথার উপর চাদর আছে বটে কিন্তু চারপাশে কোন রাখঢাক নেই। কোটরে ঢোকা চোখ নিয়ে সারা গ্রামের ছেলেপেলে আমার খাওয়া দেখছে। খাওয়া দেখছে সে বুড়োটা যে ক্ষুধার জ্বালায় সোজা হয়ে দাড়াতে পারছেনা। মনের চোখ দিয়ে খাওয়া দেখছে সেই অন্ধ বুড়িটাও।

আমার যদি বিবেক বলে কিছু থাকে তবে বুঝব ঘটনাটা ঠিক হয়নি। ভুখা মানুষের না দিয়ে খাওয়াই একটা অন্যায়। আর তাদের সামনে বসে তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে এমন খাবার খাওয়া যার খরচ দিয়ে তাদের সবার ডাল-ভাত হয়ে যেত – এটা কোন মাপের অন্যায়?

কিন্তু আমি বিবেকহীন। রাতেও একই ঘটনা ঘটালাম। পরের দিনও। প্রতিদিন একই ঘটনা চলতে থাকলে একদিন কি মানুষ জেগে উঠবেনা? আমার মুখের খাবার কেড়ে নেবেনা? যদি নেয় তখন কি তাকে খুব দোষ দেওয়া যায়?

প্রেক্ষাপটটা একটু বদলাই। আমি সুবোধ টাইপের একটা ছেলে। ছোটবেলা থেকে যে মিশনারি স্কুলে পড়ে এসেছি, সেখানে কোন মেয়ের বালাই নেই। প্রকৃতির নিয়মে শরীরে দিন বদলের ডাক এসেছে। ছাদ থেকে বারান্দায়, সেখান থেকে ঘরের জানালায় অস্থির আমি। কি যেন খুঁজে বেড়াই। বাবা-মার কানের কাছে অবিরাম ঘ্যানর ঘ্যানর করে অবশেষে ভর্তি হলাম কোচিং-এ। সেখানেই খুঁজে পেলাম পিছনের পাড়ার সেই মিষ্টি চেহারার মেয়েটিকে – কী সুরেলা তার গলার স্বর, কী চমৎকার তার হাতের লেখা। স্যর পড়ানোর ফাকে তো বটেই, বাসায় অবধি বই খোলা রেখে আমি তাকে দেখতে পাই। বিছানায় শুয়ে চোখ মুদলেও আমি তাকেই দেখি। একদিন কোচিং থেকে বেরোনোর সময় সাহস করে বলে ফেললাম – দাড়াও, কথা আছে। সে পাত্তাই দিলনা। মরিয়া হয়ে সব আবেগ ঢেলে চিঠি লিখলাম। চকিতে তার হাতে দিলাম পাড়ার মোড়ে, একটা গোলাপ সহ। চিঠিটা পড়লোও না! ছিড়ে মুখে ছুড়ে মারলো আমার। আমি অপমানিত, লাঞ্ছিত। কই কোন উপন্যাসে তো এমন ঘটেনি কোনদিন। কোন নাটকে হয়নি। কোন সিনেমাতে না। তবে আমি কী দোষ করলাম? নিজের ভেতর কুঁকড়ে যাবার সাথে সাথে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমিও চূড়ান্ত অপমান করব ওকে।

আবার প্রেক্ষাপট বদলাই। আমি সুস্থ সবল একটা ছেলে। মোটর সাইকেল মেরামতের দোকানে কাজ করি। শরীরে যৌবন এসেছে অনেক দিন হল। হলে গিয়ে এক টিকিটে দু ছবি দেখি আর হাত এবং কোলবালিশের সখ্যতায় দিন চলে। অভাবের সংসার তাই বিয়েও করতে পারিনা। হঠাৎ সেদিন ব্রেক ঠিক করাতে একটি ধনীর দুলাল আসলো। তার পিছনে বসা সাদা গেঞ্জি পড়া এক দুলালী। বুকের থেকে চোখ নামাতে পারছিলামনা। গায়ে কি যেন মেখেছে, কাছে যেতেই মাথা ঘুরতে লাগল। অনেক কষ্টে কাজ সারতে সারতে দেখলাম মেয়েটার হাত খেলা করছে ছেলেটার শরীরে। ধোঁয়া ছেড়ে যখন চলে গেল ওরা তখন পিছন থেকে আমি দেখছি ভার্জিনের বোতল। এরপর থেকে আমার জীবনের লক্ষ্য একটাই। এ মেয়েটির শরীর আমি চাইই চাই – এক রাতের জন্য হলেও চাই। হঠাৎ পাশে তাকিয়ে দেখি আমার মত দোকানের আর তিন জনও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একই দিকে তাকিয়ে। ওরাও কি তবে... আমার মতই ভাবছে?

একটা ছেলে বায়োলজিকালি যৌবনপ্রাপ্ত হয় তের থেকে পনের বছর বয়েসে, স্বপ্নকালীন বীর্যপাতের মাধ্যমে। আমাদের দেশে বিয়ে করার জন্য ন্যূনতম বয়স একুশ বছর। স্রষ্টা পরিবার গঠনের যে সামর্থ্য একটা পুরুষকে দিয়ে দিলেন সে সামর্থ্য রাষ্ট্র চেপে রাখল ছয় থেকে আট বছর। কি অদ্ভুত সেই আইন! নিয়মমাফিক বিয়ে করতে পারবেনা কেউ এই সময়ে কিন্তু অবৈধভাবে যে কারো সাথে শোয়া যাবে। একটা মেয়ে বায়োলজিকালি সন্তান ধারণের যোগ্যতা অর্জন করে বার থেকে চৌদ্দ বছরে। কিন্তু তাকে বিয়ে করতে হলে আঠার বছর হতে হবে। এ সময় সে কীভাবে দেহের ক্ষুধা মেটাবে? বিয়ের ফলে সন্তান হলে সাংবাদিকের দল ছুটে আসবে বাল্যবিবাহের হট স্টোরি কাভার করতে, বিয়ে ছাড়া সন্তান হলে নারীবাদীরা আসবে ছুটে – কিশোরী মাকে রক্ষা করতে, তার সন্তানকে হেফাজত করতে।

আমাদের আইনে ব্যভিচারের শাস্তি নেই বরং ব্যভিচারে বাধা দিলে তার শাস্তি আছে! যে রাষ্ট্র বিয়ে করে শরীরের জ্বালা মেটালে জেলে পুরবে সেই রাষ্ট্র বিয়ে না করে একই কাজ করলে চোখ বন্ধ করে থাকবে!

এবার দ্বিতীয় আসামী – সমাজ। ধরা যাক একটা ছেলের বয়স একুশ বছর, সে কি বিয়ে করতে পারবে? তার বাবা-মা বলবে পড়াশোনা শেষ কর। তারপর চাকরি কর, তারপর চাকরি করে কিছু টাকা জমাও – তারপর? হ্যা, এবার বিয়ে করলেও করতে পারো। স্কুল-কলেজ আর ইউনিভার্সিটির সতের বছরের (সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হলে বিশ) পড়াশোনা শেষ করে অন্তত পাঁচ বছর চাকরি করার পর একটা ছেলের বয়স হয় ত্রিশ। ঝরণা যেমন বসে থাকেনা তেমন যৌবনও বসে থাকেনি। একটু ডিস্কো টাইপের হলে আসল নারীদেহের স্বাদ পাওয়া হয়ে যায় এর মধ্যেই। অল্প কয়টা পয়সা দিলে গার্মেন্টসের মেসে থাকতে দেয় দু'ঘন্টা। আর তপ্ত যৌবন নিয়ে আমার ব্যাকুল বান্ধবীরা তো আছেই।

হাবলা বা অপেক্ষাকৃত সৎ টাইপের ছেলেগুলোর ভরসা এক্স মার্কা ছবি আর লক্ষ লক্ষ পর্নসাইট। বাবা-মা বেশ জানেন ছেলে বাথরুমে গিয়ে কী করে, দরজা লাগিয়ে কম্পিউটারে কী দেখে। তবু উট পাখির মত বালিতে চোখ গুঁজে থেকে বলেন – 'এ বয়সের দোষ'। আচ্ছা বয়সের দোষে ছেলেটা যদি ভার্চুয়াল জগতের কাজগুলো আসল জগতে করতে চায় তাহলে সবার এত আপত্তি কেন?

আমাদের কালের কণ্ঠ পত্রিকা আধাপাতা জুড়ে জোলি-বিপাশার ছবি ছেপে যৌনাবেদনের স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে দিচ্ছে। আমাদের প্রথম আলো বিতর্ক উৎসবের নামে অনেক কটা মেয়েকে আমার বয়'স স্কুলে এনে ঢোকাচ্ছে আমাদের চেনা-পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য, সন্ধ্যায় একটা ব্যান্ড শোও আয়োজন করে দিচ্ছে একটু কাছাকাছি হবার জন্য। আমাদের ব্র্যাক ভার্সিটি টার্কের নামে ছেলে-মেয়েদের পাশের বিল্ডিং-এ

রাখছে, প্রমের নামে ছেলে-মেয়ে একসাথে নাচতে বাধ্য করছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যলয়ের শিক্ষক হুআজাদ বইয়ে প্রশ্ন করেন একটা মেয়েকে ঘরে আনলে কী হয়? কনডম আছে, পিল আছে; পেট না বাঁধলেই হল। খারাপ কাজ কর, কিন্তু সমাজ যেন না জানে। আমাদের মুক্তমনা সোশ্যাল ডারউনিস্টরা তত্ত্ব শেখায় ধর্ষণে সন্তান ধারণের সম্ভাবনা বাড়ে। এটা তাই মনুষ্য জাতের টিকে থাকার পক্ষে সহায়ক!

– আমরা জ্ঞান অর্জন করতে থাকি।

আমাদের বাবা-মারা ডিশের লাইন ঘরে এনে দেশী গার্লের বিদেশী দেহ দেখিয়ে ছেলেদের সুড়সুড়ি দিচ্ছে। আমাদের লাক্স বিউটি শোতে বিন্দু আর মমরা শাড়ী বাঁকা করে পড়ে এসে আমাদের মনে ঢেউ তুলছে, কার কোমর কত বাঁকা সে হিসাব করে তাদের এসএমএস পাঠাতে বলছে। আমাদের বেরাদর ফারুকি ফাঁকা আপ্যার্টমেন্ট আর নৌকাতে লীলাখেলা করবার আইডিয়া আমাদের মাথায় ঢোকাচ্ছে। আমাদের বিজ্ঞাপন দেখে বোঝাই যায়না কী বিক্রি হবে গ্রামীন ফোনের সিম না একটা গ্রাম্য নারী? আড়ং এর দুধ না নারীর? আমাদের নগর বাউল গান বেঁধে জানায় একা চুমকি পথে নামলে তার পিছু নেয়াই রীতি।

– আমরা অনুপ্রেরণা লাভ করতে থাকি।

আমাদের রাস্তার মোড়ে বড় বিলবোর্ড লাগিয়ে শিক্ষা দেয়া হয় – ভাসাভির সূক্ষ শাড়ী দিয়ে কিভাবে নাভি ঢেকেও খোলা রাখা যায়। ড্রেসলাইনের পুরুষ মডেল আমাদের শিখিয়ে দেয় কিভাবে আলগা নাভিতে হাত বুলিয়ে দিতে হয়। আমাদের ভাবীরা পিঠের চওড়া জমিনের শুভ্রতা প্রকাশ করে পয়লা বৈশাখকে ডাকে। আমাদের বোনেরা গলায় রুমাল ঝুলিয়ে টাইট ফতুয়া টাইটতর জিন্স প্যান্ট সহযোগে পড়ে বসুন্ধরায় বাতাস খেতে যায়। আমাদের হাইকোর্ট আদেশ দেয় যে যা খুশি পড়বে কিছু বলা যাবেনা।

– আমরা উন্মুখ চাতকেরা উন্মুখা চাতকীদের করা ইশারা পেয়ে যাই।

কিন্তু রাষ্ট্র আর সমাজ কি চায় আমাদের কাছে? আমরা সেই সব ভুখা মানুষদের মত যাদের সামনে দিয়ে পোলাও-কোর্মা আর মুরগির ঠ্যাং যাবে আর তারা হাঁ করে দেখে বলবে আহা কি চমৎকার খাবার; কিন্তু তাদের একটুও খেতে ইচ্ছে করবেনা? আমরা আদমের সেই সব পুরুষ সন্তান যারা একজন সঙ্গীনির অভাবে মনে মনে মরবে। আমাদের সামনে নানাভাবে নারীর মাংশ উপস্থাপন করা হবে আর আমাদের ধজ্বভঙ্গ-ঋষির নির্লিপ্ততায় তা উপেক্ষা করে যেতে হবে?

যে ভদ্রলোকটা টকশো আর পত্রিকায় বিবৃতি দেয় ইভ টিজিং এর বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার তার ভন্ডামির মুখোশে আমি থুতু দেই। আমি থুতু দেই সেই সমাজপতির নষ্টামিতে যে একটা বেকার ছেলের একটা কাজের ব্যবস্থা করেনা যাতে সে একটা বিয়ে করতে পারে; কিন্তু তাকে বখাটে ছেলের তকমা লাগিয়ে জমি আর রাজপথ দখলের কাজে লাগায়। আমি থুতু দেই এই সমাজের মুখে যা আমার পুরুষত্ব প্রাপ্তির পরের পনের বছরের পুরোটা সময় ধরে এডাম টিজিং করে আজ আমাকে ইভ টিজার বানিয়েছে।

আইন করে, 'জনমত' গঠন করে ইভ টিজিং বন্ধ করা যায়নি, যাবেওনা। সেক্যুলার না মানুষকে মুসলিম হতে শেখাতে হবে। এত কষ্ট করে আইন না বানিয়ে আল্লাহ যে আইন দিয়েছেন তা মেনে নিতে হবে। ইভ টিজিং কেন বাংলাদেশ সব পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের সব সমস্যার একটাই ম্যাজিক বুলেট আছে – ইসলাম। আমার মেয়েকে ইভ টিজিং এর হাত থেকে বাঁচাতে চাইলে হিজাব পরাই, মুসলিমাহ বানাই। সমাজকে রক্ষা করতে চাইলে আমার ছেলেকে চোখ নামিয়ে চলতে শেখাই, মুসলিম হতে শেখাই, তাড়াতাড়ি বিয়ে দেই।

রাস্তার মোড়ের বখাটে ছেলেগুলোর নষ্ট হবার পেছনে আমাদের অবদান আছে বৈকি। খারাপ হবার উৎসগুলো বন্ধ না করলে নিত্য-নতুন খারাপ আসতেই থাকবে? নষ্টামির গাছের গোড়ায় পানি আর সার ঢেলে পাতা ছাটাই করলে কি কোন লাভ হবে?

ইসলামের বাঁধন দিয়ে মানুষের ভিতরের পশুটাকে বেঁধে না রাখলে আমাদের সমাজ ঐ অজগরের মত মরে যাবে। নিশ্চিত যাবে। অবধারিত যাবে।

লাভ এট ফার্স্ট সাইট

“The moment I saw her, a part of me walked out of my body and wrapped itself around her. And there it still remains.”

খুব বিখ্যাত একটি বইয়ের দুইটি লাইন। লেখিকা এখানে যেটার কথা বলছেন ইংলিশে সেটাকে বলে ‘Love at first sight’। সোজা বাংলায় প্রথম দেখায় কিছু চিন্তা না করেই প্রেমে পড়া। ছেলেটার ঠিক তা-ই হলো। সে প্রথম দেখায় ক্রাশ খেলো। অবশ্য ক্রাশ খাবার কারণ কিন্তু যথেষ্ট। কোমর পর্যন্ত ঢেউ খেলানো চুলের অধিকারী মেয়েটা যখন সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, চোখ ফেরানো বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ইশ, কী মায়াবী মুখ! এমন একটা মুখের দিকে তাকিয়েই তো সারাটা জীবন পার করে দেয়া যায়। ছেলেটা হঠাৎ আবিষ্কার করে এই একজন সামনে আসলেই সে প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে যায়। হার্ট খুব দ্রুত বিট করা শুরু করে। এমনকি নার্ভাসনেসের কারণে তার হাঁটুও কাঁপতে থাকে।

ছেলেটা বুঝতে পারলো এই মেয়েকে ছাড়া তার পক্ষে বাঁচতে পারা সম্ভব না। যে করেই হোক তাকে তার পেতেই হবে! অনেক কষ্টে সে মেয়েটার ফোন নাম্বার জোগাড় করে। চেষ্টা করে মেয়েটার হৃদয়ে একটু হলেও জায়গা করে নিতে। কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই রাজি হয় না। তবুও সে চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিছু সময় চলে যায়-

এক মাস।
দুই মাস।
তিন মাস।

মানবচরিত্রের আজন্ম প্রকৃতি একসময় তাদেরকে একে অপরের দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য করে। জীবন সম্পর্কে প্রচণ্ড উদাসীন ছেলেটাও হুট করে জীবনে নতুন এক

প্রেরণা খুঁজে পায়। অসম্ভব শান্তি লাগে তার অপরপাশে মিষ্টি গলাটা শুনতে পেরে। সারা রাত কথা বলার পরেও তার মনে হয় রাতটা এত দ্রুত শেষ হয়ে গেলো কেন? মনে হয় যেন নিজ ঘরে না আলাদা কোনো এক জগতে তারা এক সাথে কথা বলছে অনেকটা উপন্যাসের লাইনের মতো-

"like I was not in my room and he was not in his, but instead we were together in some invisible and tenuous third space that could only be visited on the phone."

আবারো কিছু সময় খুব দ্রুতই কেটে যায়।

এক বছর।
দুই বছর।
তিন বছর।

এরপর ছেলেটা হঠাৎ করে আবিষ্কার করে আকর্ষণে কেন যেন ভাটা পড়ে গেছে। আগের মতো আর তার মেয়েটাকে দেখলে হার্ট দ্রুত বিট করে না। হৃদয়ের সেই প্রশান্তিও কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। মেয়েটাও বুঝতে পারে সবকিছু আর আগের মতো নেই। মনোমালিন্য শুরু হয়। একসময় সবকিছু শেষ হয়ে যায়। খুব বিষন্ন কিছু দিন কাটে। তারপর? তারপর আবার ছেলেটার চোখে নতুন কাউকে ভালো লাগতে শুরু করে। তারপর আবার ...।

——

আমাদের চারপাশে হওয়া প্রায় ৯০ ভাগ বিয়ে-পূর্ববর্তী রিলেশনের একটা কমন গল্প বলার চেষ্টা করলাম এতক্ষণ। বেশিরভাগ সময়েই সম্পর্কগুলো বিয়ে পর্যন্ত পূর্ণতা পায় না। আর বিয়ে পর্যন্ত গড়ালেও আবেগের সাথে সাথে যখন সীমাহীন দায়িত্ব এসে ভর

করে, তখন আবেগগুলো ফিকে হওয়া শুরু করে। 'আমি ওর মন পড়তে পারি'-এমন দাবি করা প্রেমিকযুগল বিয়ের পর আবিষ্কার করে সম্পূর্ণ নতুন আরেকজনকে। এ কারণেই হয়তো 'Love Marriage'-গুলোতে ডিভোর্সের হার অস্বাভাবিক রকমের বেশি। প্রফেসর ইসমাইল আবদুল বারির একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যারা বিয়ের আগে প্রেম করে, বিয়ের পর তাদের ৭৫% এর ক্ষেত্রে সম্পর্কটার শেষ হয় ডিভোর্সের মাধ্যমে। অন্যদিকে, আল্লাহ্‌তা'আলাকে ভয় করে যারা এ হারাম কাজ থেকে বিরত থাকে, তাদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা অনেক কম। কেবল ৫%। কেন এমন হয়?

শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ (হাফি) তার উত্তরে বলেন,

"একজন আরেকজনের সাথে ডেটিং করে, একা সময় কাটিয়ে, চুমু খেয়ে আরো অন্যান্য হারাম কাজ করার পর যে বিয়ে হয়, সে বিয়ে কখনোই সুখের হবে না। কারণ, তারা আল্লাহ্‌র বেঁধে দেয়া সীমা লঙ্ঘন করেছে। তাদের সম্পর্কের ভিত্তি হয় পাপের মাধ্যমে। আর পাপ মানুষের জীবনের বরকত কমিয়ে দেয়। আল্লাহ্‌তা'আলার সাহায্য কমিয়ে দেয়।"

প্রেমের বিয়ে ভাঙ্গার পেছনে শায়খ বেশ কয়েকটি কারণও উল্লেখ করেছেন-

১। বিয়ের আগে সাধারণত আরেকজনের দোষ ধরা পড়ে না। খালি ভালোটাই নজরে আসে। তাকে আমরা সবসময় সাজানো-গোছানো অবস্থায় দেখি। তার গা থেকে পারফিউমের সুন্দর ঘ্রাণ আসে। সারাদিন ক্লাস শেষে তার সাথে কথা বললে মন ভালো হয়ে যায়।

কিন্তু বিয়ের পর উল্টো পিঠটা নজরে আসে। তার অগোছালো দিকটাও আমরা দেখতে পাই। তার গা থেকে শুধু পারফিউম না ঘামের গন্ধটাও পাওয়া যায়। সারাদিন কাজ

করে কোন কথা না বলে যখন সে বিছানায় নাক ডেকে ঘুমায়, তখন তার সাথে বিয়ের আগের মানুষটাকে মেলানো যায় না। এ জন্য আরবিতে একটি প্রবাদ আছে-

وعين الرضا عن كل عيب كليلة

"সব প্রেমিকের চোখ অন্ধ হয়ে যায়।"

আর একসময় চোখ খুলে যায়। তবে বড্ড দেরি হয়ে যায়।

২। এরা স্বপ্নের জগতে থাকে। বিয়ের পর এই করবো, সেই করবো। কিন্তু যখন বিয়ের পর জীবনে নানা সমস্যা আসতে শুরু করে, তখন স্বপ্ন ভঙ্গের সাথে সাথে তাদের বিয়েটাও ভেঙ্গে যায়।

৩। বিয়ের আগে সাধারণত ঝগড়া-তর্ক এসব কম হয়। ব্রেকআপের ভয়ে অনেক উদ্ভট যুক্তিও অপরপক্ষ মেনে নেয়। কিন্তু বিয়ের পর তা আর সম্ভব হয় না। তখন কথার বদলে পাল্টা কথা হয়। একসময় তা ভয়াবহ ঝগড়ায় রূপ নেয়। সম্পর্কগুলো ভেঙ্গে দেয়।

৪। আমাদের সবার ভেতরই দুইটি সত্তা থাকে। ভালো আর খারাপের মিশ্রণ থাকে। প্রেমের সময় শুধু ভালো দিকটাই নজরে আসে। কারণ শয়তান তখন এই হারাম বিষয়টাকে বিউটিফাই করে থাকে বেশি করে। কিন্তু বিয়ের পর যখন অপর দিকটা সামনে আসে তখন তা আর আমরা মেনে নিতে পারি না।

মোটকথা, প্রেম করে যে বিয়ে করা হয় তা **আল্লাহর সন্তুষ্টির** জন্য করা হয় না। তাই এতে আল্লাহর কোনো রহমত থাকে না। প্রথম প্রেম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত পাশে থাকার যে ফ্যান্টাসি সমকালীন সাহিত্যে দেখানো হয়, তা কেবল উপন্যাস কিংবা

রূপালী পর্দাতেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে। 'কাছে আসার গল্প'-গুলোতে দূরে সরে যাবার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি।

তাই আজ আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কাছে আসার গল্প বলবো।

আমাদের গল্পের নায়ক মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ(সা)। ধীর-স্থির যুবক। চাচার ঘরে মানুষ হয়েছেন। সমাজের কলুষতা থেকে দূরে নির্জনে থাকতেই বেশি পছন্দ করেন। প্রচণ্ড সৎ ও সত্যবাদী হবার কারণে সবাই তাঁকে 'আল-আমিন' নামে ডাকে। সম্ভবত এ কারণেই তিনি সে সময়ের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যবসায়ী খাদিজার (রা) চোখে পড়েন। তিনি মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর হয়ে ব্যবসা করার জন্য প্রস্তাব পাঠান।

মুহাম্মদ (সা) এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তিনি খাদিজার (রা) দাস মাইসারাহ ও পণ্যসামগ্রী নিয়ে সিরিয়ার পথে রওনা দিলেন। সিরিয়ায় পৌছে তিনি গির্জার কাছে এক গাছের নিচে বিশ্রাম নিলেন। তখন গির্জা থেকে এক পাদ্রী বের হয়ে মাইসারাহকে জিজ্ঞেস করলেন, "গাছটির নিচে যিনি বিশ্রাম নিচ্ছে উনি কে?" মাইসারাহ বললেন, "তিনি হারামের অধিবাসী।" পাদ্রী তখন বললেন, "এই গাছে নবি ছাড়া আর কেউ কখনো বিশ্রাম নেয়নি।"

সে খুব অবাক হয়ে আরো দেখতে পেলো দুজন ফেরেশতা দুপুরের তীব্র রোদে মুহাম্মদ (সা)-কে সবসময় রক্ষা করে চলছেন। অলৌকিক এই ঘটনা আর পাদ্রীর ঐ কথাটি সিরিয়া থেকে ফিরে মাইসারাহ খাদিজা (রা)-কে অবহিত করে। ঘটনাটি খাদিজার (রা) মনে দাগ কাটে। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফলকে, যিনি ছিলেন সে সময় তাওরাত ও ইঞ্জিলের একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত, পাদ্রীর কথাটি জানান। সব শুনে ওরাকা বললেন,

“খাদিজা! এসব ঘটনা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, মুহাম্মদ এ উম্মাতের নবি। আমি জানতাম, তিনিই হবেন এ উম্মাতের প্রতীক্ষিত নবি। এটা সে নবিরই যুগ।”

ওরাকার এ কথা খাদিজা (রা)-কে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। এদিকে ব্যবসাতেও মুহাম্মদ (সা) রেকর্ড পরিমাণ লাভ করে আসেন। মুহাম্মদ (সা)-এর সততা তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি মুহাম্মদ (সা)-কে বিয়ে করতে আগ্রহবোধ করেন। বাংলাদেশের কিছু বিজ্ঞানমনস্ক(!) লেখকরা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, রাসূল (সা) সম্পদের লোভে খাদিজা (রা)-কে বিয়ে করেছিলেন। অজ্ঞ (নাকি মিথ্যুক?) লোকগুলো এ কথা কখনোই বলবে না, ব্যবসা এবং বিয়ের প্রস্তাব কিন্তু খাদিজা (রা) স্বয়ং রাসূল (সা)-কে দিয়েছিলেন। চাচা আবু তালিবের সাথে পরামর্শ করে মুহাম্মদ (সা) বিয়েতে রাজি হন। তখন তাঁর বয়স ছিলো ২৫ আর খাদিজা (রা)-এর বয়স ছিলো চল্লিশ। কিন্তু বেঁকে বসেন খাদিজা (রা)-এর পিতা। বেশ মজার একটা উপায়ে তিনি বাবাকে রাজী করালেন।

খাদিজা (রা) কিছু খাবার ও পানীয় প্রস্তুত করে তাঁর পিতা ও কুরাইশদের কয়েকজনকে দাওয়াত দেন। খাবার ও পানীয় গ্রহণ করে সবাই নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তারপর তিনি তাঁর পিতাকে বললেন, “মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। আমাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়ে দাও।” তখন তিনি খাদিজা (রা)-কে মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। খাদিজা তাঁর পিতাকে হুল্লা (বিশেষ পোষাক) পরিয়ে সুগন্ধী মেখে দেন। সে সময়ের লোকজন বিয়ের সময় বাবাকে এমন পোশাক পরিয়ে সুগন্ধী লাগিয়ে দিতো। এদিকে নেশার ঘোর কেটে যাবার পর তাঁর পিতা দেখেন- তার গায়ে সুগন্ধী ও হুল্লা! এসব দেখে তিনি বলে উঠেন, “আমার এ কী অবস্থা! এসব কী!” খাদিজা (রা) তখন বললেন, “তুমি আমাকে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে বিয়ে দিয়েছো।” তাঁর পিতা বললেন, “আবু তালিবের অনাথ ভাতিজার সাথে আমি (মেয়ে)

বিয়ে দেবো! না, তা হবে না।" খাদিজা (রা) বললেন, "কী লজ্জার কথা! তুমি নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলে- লোকদের এ কথা বলে কি কুরাইশদের নিকট তুমি নিজেকে নির্বোধ প্রমাণ করতে চাচ্ছো?" এ কথা বলতে থাকায় একসময় তিনি রাজী হয়ে যান।"

ঘটনাটি পড়ে অনেকের মনে হতে পারে, খাদিজা (রা) আগ্রহের আতিশয্যে এমনটা করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পরে কি খাদিজা (রা)-এর মোহ কাটতে শুরু করেছিল? না, ঘটনাটি আমাদের বর্তমান সময়ের মতো এগোয়নি। বরং তাঁর মুগ্ধতা বহুগুণে বেড়েছিলো। মুহাম্মদ (সা) খাদিজা (রা)-এর সম্পদের কোনো অপব্যবহার না করে আগের মতোই সাদা-সিধে জীবনযাপন করতে থাকেন। বিয়ের পর মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে খাদিজা (রা)-এর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি নবুওয়্যাতের ঘটনা থেকে। মুহাম্মদ (সা) যখন প্রথম ওহীপ্রাপ্ত হন এবং জীবনের আশঙ্কা করে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে প্রবেশ করেন, তখন খাদিজা (রা) তাঁকে বস্ত্রাবৃত করে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছিলেন,

"আল্লাহ্‌র কসম, কক্ষনো না। আল্লাহ্ আপনাকে কক্ষনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন। নিঃস্বকে সাহায্য করেন। মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।"

রাসূল (সা) আর খাদিজা (রা) এতটাই পরিপূরক ছিলেন যে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি দ্বিতীয় কোন বিয়ে করেননি। ইবরাহীম (রা) ব্যতীত রাসূল (সা)-এর সকল সন্তান-সন্ততি খাদিজার (রা) গর্ভেই হয়েছিলো। খাদিজার (রা) মৃত্যু রাসূলকে (সা) এতটাই ব্যথিত করে যে, তিনি যে বছর মারা যান, সে বছরকে সীরাতকাররা عـــام الحـــزن বা 'বিষন্নতার বছর' নামে অভিহিত করেছেন।

রাসূলের (সা) ভালোবাসাও আমাদের ভালোবাসার মতো ঠুনকো ছিল না। তাই মৃত্যুর পরেই তা শেষ হয়ে যায়নি। পরবর্তীতে দ্বীনের স্বার্থে ও ওহীর ইশারায় তিনি বেশ কয়েকটি বিয়েতে আবদ্ধ হন। কিন্তু খাদিজা (রা) সবসময়ই তাঁর স্মৃতিতে অমলিন ছিলেন। যখনই তাঁর সামনে খাদিজা(রা)-এর নাম স্মরণ করা হতো, তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে যেতো। তিনি তাঁর জন্য দু'আ করতেন। অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। গভীর আবেগে বলতেন-

إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا

"(আল্লাহ্ তা'আলাই) আমার অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা গেঁথে দিয়েছেন।"

খাদিজার (রা) মৃত্যুর পর একবার তাঁর বোন হালাহ (রা) রাসূলে (সা)-এর সাথে দেখা করতে আসলেন এবং ভেতরে প্রবেশ করতে অনুমতি চাইলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অনেকটা খাদিজার (রা) মতোই। সে স্বর শুনেই রাসূল (সা)-এর খাদিজার (রা) কথা মনে পড়ে গেলো। তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! এটা যেন হালাহ হয়।" আয়েশা (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এ কথা শুনে তাঁর মনে ঈর্ষার উদয় হলো। তিনি বললেন, "আপনি এখনো কুরাইশের সে দাঁত পড়ে যাওয়াকে বৃদ্ধার কথা স্মরণ করেন! তিনি তো অনেক আগেই মারা গিয়েছেন আর আল্লাহ্আপনাকে তাঁর চেয়ে উত্তম কাউকে দিয়েছেন।" রাসূল (সা) তখন প্রচণ্ড রেগে গেলেন। বললেন, "আল্লাহর কসম ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার চেয়ে উত্তম বদলা দেননি। মানুষ যখন আমার উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিলো, তখন সে আমার উপর ঈমান এনেছিলো। যখন সবাই আমায় মিথ্যাবাদী বলেছে, তখন সে আমাকে সত্যবাদী বলেছে। যখন সবাই আমাকে বঞ্চিত করেছে, তখন সে আমাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে। আর তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ্আমাকে সন্তান দান করেছেন।"

খাদিজা (রা)-এর মৃত্যুর পর রাসূল (সা) তাঁর বান্ধবীদের উপহার পাঠাতেন। এমনকি তিনি যদি জানতেন কেউ খাদিজা (রা)-কে পছন্দ করে, তাকেও তিনি উপহার পাঠাতেন। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সা) যখন কোন উপহার পেতেন, তিনি বলতেন, 'যাও এটা ওমুকের কাছে নিয়ে যাও। কারণ, সে খাদিজার বান্ধবী ছিলো। আর এটা ওমুকের কাছে নিয়ে যাও। কারণ, সে খাদিজাকে পছন্দ করতো।"

নবি (সা) যখনই কোন ছাগল জবাই করতেন, তখন খাদিজার (রা) ভালোবাসার স্মরণে সে ছাগলের গোশত খাদিজা (রা)-এর বান্ধবীদের উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন। কাউকে খুঁজে না পেলে মদিনার পথে পথে খাদিজা (রা)-এর বান্ধবীদের খুঁজে বেড়াতেন। আয়েশা (রা) তাই একদিন রাসূল (সা)-কে অভিমানের সুরে বললেন, "মনে হয় খাদিজা ছাড়া দুনিয়াতে কোন নারীই নাই!" রাসূল (সা) তখন বললেন, "সে তো এমন আর এমন ছিলো (বলে তিনি খাদিজা(রা)-এর প্রশংসা করতে লাগলেন)। আর তাঁর গর্ভে আমার সন্তানেরা জন্মেছিলো।"

একদিন রাসূল (সা)-এর কাছে বৃদ্ধ এক মহিলা এলো। রাসূল (সা) তার পরিচয় জানতে চাইলে সে বললো, "আমার নাম জাসসামাতুল মুজানিয়া।" রাসূল (সা) বললেন, "বরং আপনি হচ্ছেন হুসসানা। আপনি কেমন আছেন? আপনার লোকজনদের খবর কী? আপনার দিনকাল কেমন চলছে? আপনাকে শেষবার যখন দেখছিলাম তারপর থেকে আপনার অবস্থা এখন কেমন?" তিনি জবাবে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা ও মাতা আমার জন্য কুরবান হোক! আমরা ভালো আছি।" মহিলাটি চলে যাবার পর আয়েশা (রা) রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এতো আদ্রতা ও মায়ার সাথে এ বৃদ্ধার সাথে কেন কথা বললেন?" রাসূল (সা) জবাব দিলেন, "আয়েশা! যখন খাদিজা বেঁচে ছিলো, তখন সে প্রায়ই আমাদেরকে দেখতে আসতো।"

বদর যুদ্ধে বন্দীদের মধ্যে ছিলেন রাসূল (সা)-এর জামাই আবুল আস। তিনি রাসূল (সা)-এর কন্যা যায়নাবের (রা) স্বামী ছিলেন। মুক্তিপণ হিসেবে যায়নাব (রা) নিজ গলার হার স্বামীর জন্য পাঠিয়ে দেন। এ হার খাদিজা (রা) যয়নাবের (রা) বিয়ের সময় নিজের গলা থেকে খুলে দিয়েছিলেন। রাসূল (সা) এ হার দেখে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। তাঁর চোখ পানিতে ভিজে গেলো। তিনি সাহাবিদের বললেন, "তোমরা যদি রাজি থাকো, তাহলে এই হার ফিরিয়ে দাও এবং পণ ছাড়াই বন্দীকে মুক্ত করে দাও।"

আমাদের বর্তমান সময়ে বিয়ের একটা প্রধান কারণ থাকে সাময়িক মোহ ও উদাম যৌনতা। ৪০ বছরের একজন প্রৌঢ়ার সাথে ২৫ বছরের এক যুবকের বিয়েতে এসবের কিছুই ছিলো না। ছিলো **আল্লাহর জন্য ভালোবাসা** এবং পারস্পরিক চিরস্থায়ী মুগ্ধতা। তাহিরা ও আল-আমিনের ভালোবাসা তাই একজনের মৃত্যুতেই শেষ হয়ে যায়নি।

হুজুররাও কিন্তু প্রেমের গল্প লিখে যায়। তবে সে গল্প লেখা হয় নীরবে। সে গল্প দেহের ভাঁজ দেখে আকৃষ্ট হওয়া নিয়ে শুরু হয় না। সে গল্পে চোখাচোখি নেই। সে গল্পের জুটিরা নীল রঙয়ের শাড়ি আর হলুদ পাঞ্জাবী পড়ে রাস্তায় হাত ধরে হাঁটে না। নামীদামী রেস্তোরায় সেলফি তুলে চেক ইন দেয় না। সে গল্প সবার চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না। তাই এদের নিয়ে কোনো 'কাছে আসার গল্প' লিখা হয় না।

বড্ড নীরস গল্প, তাই না? এ গল্পে যে কিছুই নেই!

হ্যাঁ, আসলেই কিছু নেই। এ গল্পে সাময়িক মোহ কেটে যাবার পর মনোমালিন্য নেই। এ গল্পে অবিশ্বাস নেই। সন্দেহ নেই। নতুন কাউকে পাবার পর কমিটমেন্ট ভেঙ্গে ফেলা নেই। এ গল্পের জুটিরা একে অপরকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করে না। এ গল্পের নায়িকারা এবোরেশান করতে না পেরে লোকলজ্জার ভয়ে সুইসাইড করে না। সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানকে রাস্তায় ধুঁকে ধুঁকে মরবার জন্য ফেলে আসে না। এ গল্পের হিরোরা

হতাশা ঠেকাতে নেশা শুরু করে না। মেয়ের দেহ ভোগের পর তাকে ডাস্টবিনে ফেলে দেয় না। মেয়েদেরকে পণ্য হিসেবে দেখে না।

এ তো সব না আর না। তাহলে এই গল্পে কী আছে? কিছুই কি নেই?

আছে, থাকবে না কেন? আছে সততার মুগ্ধতা। বিপদে আশার বাণী। আছে একে অপরের প্রতি আত্মবিশ্বাস। আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস। **কারণ, এ ভালোবাসা তো আল্লাহর জন্যই।**

কিশোর বয়সে আমি মনে করতাম হুজুরদের জীবন ভালোবাসাশুন্য। প্রেমহীন। কিন্তু এখন আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ও পবিত্রতম 'লাভ স্টোরি' হুজুররাই লিখে গিয়েছে। আমরা বর্তমান প্রজন্ম স্বল্প আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে অধিক আলোতে অন্ধ হয়ে যাই। এ কারণেই হয়তো রোমিও-জুলিয়েট নিয়ে হাহাকার করা প্রজন্ম খাদিজা (রা)-মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে কিছুই জানে না।

আমাদের বর্তমান প্রজন্মের ভালোবাসা 'আনা উহিব্বুকি' (আমি তোমাকে ভালোবাসি)-তেই শেষ হয়ে যায়, সেখানে 'ফিল্লাহি' (আল্লাহ্র জন্যে) কথাটি থাকে না। মহান আল্লাহ তা'আলা এসব চোখ-ধাঁধানো অথচ অন্তঃসারশুন্য প্রেম-ভালোবাসা থেকে আমাদের দূরে রাখুক।

আল্লাহ্সুবহানু তা'আলা আমাদের সেই পবিত্র ভালোবাসার সাথে যুক্ত করুন, যে ভালোবাসা কখনো হারিয়ে যায় না। মরেও যায় না। যে ভালোবাসার কণ্ঠস্বর মৃত্যুর পরেও আবেগতাড়িত করে।

যে ভালোবাসার কারণেই স্ত্রী গভীর রাতে একসাথে তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য স্বামীর মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। অসম্ভব সুন্দর একটা তারাভরা রাতে গভীর মমতায় আর্দ্র এক কণ্ঠ বলে উঠে-

“আনা উহিব্বুকি ফিল্লাহ।”

আধার আলো

১

পেটের মধ্যে হঠাৎ একটা গুঁতো খেয়ে চমকে উঠলাম, কদিন ধরেই দেখছি পেটের মধ্যে লাগে কী যেন মোচড়ামুচড়ি করছে। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। বড়ো কোনো অসুখ হলো না তো! কিছু একটা হলেই আমার প্রথমে মরার চিন্তা মাথায় আসে। ছোটবেলা থেকেই আমি একটু ভীতু প্রকৃতির। একবার জ্বর হলো ছোটবেলায়, সাথে দুইবার হড়হড় করে বমি করলাম, বমির সাথে রক্ত দেখে আমি ভয়ে শেষ! মনে মনে ভাবলাম ব্লাড ক্যান্সার, আমি বুঝি মারা যাচ্ছি। চোখ ঠেলে পানি বেরিয়ে এলো, যতোটা না অসুখের প্রকোপে, তারচেয়ে অনেক বেশি আশু মৃত্যুচিন্তায়। এই পৃথিবী থেকে এতো ছোট বয়সেই চলে যাবো? সে যাত্রা অবশ্য বেঁচে গেছিলাম...কিন্তু এবার কী হলো?

চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে বসে আছি, এদিকে মিতু ফোন দিলো। মিতু আমার সাথেই পড়ে, এক নম্বরের বদ মেয়ে। দুনিয়ার সব ছেলেকে এক হাতে কিনে আরেক হাতে বেঁচতে পারবে। ছেলে পটাতেও সেরা, ছেলে নাচাতেও সেরা। ওর সামনে দুনিয়ার সকল প্লেবয় শিশু। তবে প্রেমিকা হিসেবে যেমনই হোক, বন্ধু হিসেবে অসাধারণ। এমন কোনো বিপদ-আপদ নাই যখন ওকে পাশে পাওয়া যায় না। একটা ডাক দিলে দিন নাই, রাত নাই, হাজির হবে। বাসা থেকেও প্রচুর স্বাধীনতা পায়। ধনীর ঘরের আদরের দুলালি, আমাদের মতো এতো রেস্ট্রিকশন নাই, তাই বাপ-মায়ের সাথে অতো লুকোছাপা করতে হয় না।

- হ্যালো, হ্যাঁ বল।
- কীরে এতোক্ষণ লাগে ফোন ধরতে?
- একটু টেনশনে ছিলাম....

- ক্যান কী অইসে?
- মনে হয় বড়ো কোনো অসুখ। ফট কইরা মরে যাবো...
- ঢং করস? কী হইসে ঠিক করে বল
- পেটের মধ্যে কয়দিন ধরে কেমন জানি করতেসে,
- হাগু পাইসে ডারলিং? হি হি হি...
- আমি সিরিয়াস দোস্ত। একটু আগেই হঠাৎ মনে হইলো একটা শিং মাছ গুঁতা মারলো, এই যে এইমাত্র আবার!! খুবই টেনশনে আছি মিতু, অসুখ-টসুখ কী যে হইলো...
- ওহ নো! তুই এতো টেনশন করিস না, তোর প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা আছে তো? না করে থাকলে টেস্ট করে আমাকে একটা কল দে।

আমার বুকের মধ্যে ছ্যাৎ করে উঠলো! মিতুর মুখে কিচ্ছু আটকায় না। প্রেগনেন্সি টেস্ট ওর জন্য ছেলেখেলা। আমার তো কথাটা মাথাতেই আসে নাই।

আচ্ছা রাখি এখন, বলে কোনোমতে ফোনটা রেখেই দৌড় দিলাম। ড্রয়ারের মধ্যে কাপড়-চোপড়ের তলে রাখা স্ট্রিপগুলো থেকে একটা স্ট্রিপ টেনে বের করে হাতে নিলাম। মাথা দপদপ করছে। সত্যিই যদি এমন কিছু হয়! কী করবো, কোথায় যাবো! সুমন! সুমনকে একটা ফোন দিতে হবে এক্ষুণি!

ফোনটা তুলে নিজের অজান্তেই আবার মিতুকেই লাগালাম।

- করেছিস?
- সাহস পাচ্ছি না। যদি সত্যি প্রেগন্যান্ট হই? আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম।
- তুই এখনও দাঁড়ায় আছিস স্টুপিড!! যা তুই, আগে হোক তারপর বাকি চিন্তা। আমি ফোন ধরেই আছি, তুই এক্ষুণি করে আয়।
- ওকে!

একটা দাগ একটু একটু করে ভেসে উঠছে। একটা মানে নেগেটিভ...মাথা কাজ করছে না। বাথরুমে বসেই মনে মনে আল্লাহকে ডাকছি! "হে আল্লাহ, নেগেটিভ দাও, নেগেটিভ দাও..." একটা রেখা এখন পুরোটা ভেসে উঠেছে। আরেকটা রেখা না ভাসলেই হলো। "ওহ আল্লাহ! আমি ভালো হয়ে যাবো, নামাজ পড়বো পাঁচ ওয়াক্ত, আরেকটা দাগ যেন না উঠে... প্লীজ প্লীজ প্লীজ..." একি! আরেকটা দাগ.. আস্তে আস্তে দ্বিতীয় দাগটাও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। না, এ হতে পারে না। আমি আর সুমন সব সময় প্রোটেকশন ব্যবহার করেছি। তাহলে, কীভাবে!

২

ঠোঁট-মুখ শুকিয়ে গেছে। আরেকবার টেস্ট করতে হবে। এখনই নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। অন্য কোনো কারণে কি পজিটিভ রেজাল্ট দেখাতে পারে? দেরি করা যাবে না, কালই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

- হ্যালো, মিতু।
- বল
- আই থিঙ্ক আই অ্যাম প্রেগন্যান্ট। তুই কালই আমার সাথে ডাক্তারের কাছে যেতে পারবি?
- ওকে নো প্রবলেম! বাট ডোন্ট প্যানিক মাই লাভ, ওকে?
- ওকে

ফোনটা ছেড়ে সোফাতেই গা এলিয়ে দিলাম। খুব ক্লান্ত লাগছে। হাতটা অটমেটিক চলে গেলো পেটের ওপর। আমার পেটে সত্যিই কি সুমনের বাচ্চা? প্রথম বাচ্চা পেটে আসার অনুভূতিটা কেমন হওয়ার কথা? ভয়, আতঙ্ক, উদ্বেগ ছাড়া আমার মধ্যে আর কোনো অনুভূতিই কাজ করছে না।

মিতুর সাথে অদ্ভুত একটা হাসপাতালে গেলাম পরদিন। আমি জানি, ও এসব জায়গা ভালো চেনে। ওর অভিজ্ঞতা আছে। হাসপাতালে পরীক্ষা করেও একই রিপোর্ট পেলাম। ডাক্তার লোকটা দুলেদুলে হেসে বললো, ডোন্ট ওয়ারি, আমাদের সব ব্যবস্থা আছে। শুধু একটা স্ক্যান করে জেনে নিন প্রেগনেন্সি কতদিনের হলো তিন-চার মাসের হলে সহজেই ব্যবস্থা করা যাবে। খুবই পরিষ্কার ইঙ্গিত। অবশ্য আমি মোটামুটি মানসিক প্রস্তুতি আগে থেকেই নিয়ে এসেছি, বিয়ের আগে এই মুহূর্তে বাচ্চা পেটে আসলে অ্যাবরশন করাবো। এছাড়া আর কীই বা উপায়? সুমনের এখনও পড়াশোনাই শেষ হয় নি। বিয়ে করার মতো কোনো সামর্থ্য ওর এখনও নেই। আর আমার বাবা-মায়ের কাছেও সুমনের কথা তোলার প্রশ্নই আসে না! একটা বেকার সমবয়সী ছাত্রের কাছে মেয়ে বিয়ে দেবে –

এতোটা পাগল তারা এখনও হন নি। হাসপাতাল থেকে বের হয়েই প্রথমে সুমনকে ফোন দিলাম।

- দেখা করতে পারবে? খুবই আর্জেন্ট।

সুমন আধ ঘণ্টার মাঝেই চলে এলো। আমি ডাকলে সব ছেড়ে হলেও ও ঠিকই আসবে। আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে সুমন। ওর সাথে কথা না বলে একা একা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাই না আমি।

মিতু সাথেই ছিল। সুমনের কাছে ব্যাপারটা ও-ই খুলে বললো। দেখতে পেলাম সঙ্গে সঙ্গেই ওর মুখের রঙ বদলে গেলো। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিলো সুমন। আমি একপাশে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছি। সুমন ডেকে আমাকে কাছে নিলো। খুবই আদর করে বললো, চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার মুখ দিয়ে স্বগতোক্তির মতো একটা কথা বেরিয়ে এলো, "আমরা এখন কী করবো?"

- দেখো জান, বিয়ে করা এখন আমাদের জন্য 'ওয়াইজ' হবে না। তুমি তো জানো আমি এখনও স্টুডেন্ট, আর আংকেল-আন্টিও এখন তোমাকে বিয়ে দিবে না। তাছাড়া এখন বিয়ে করলে তোমার পড়াশোনা, ক্যারিয়ারের কী হবে! সো, আসো আমরা অ্যাবরশন করে ফেলি। বিয়ে হলে আমরা দুইজন রেডি হয়ে আমাদের বেবি নিবো, কেমন?

আমি সুমনের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলাম। আমাদের বাচ্চা অ্যাবোর্ট করার কথা ভেবে হঠাৎ খুব খারাপ লাগতে শুরু করলো। যদিও বুঝতে পারছি এমন দুঃখ পাওয়ার কোনো কারণই নেই। সুমন একদম প্র্যাকটিকাল কথাটাই বলেছে। আমাদের পক্ষে এখন বিয়ে করাটা অসম্ভব ব্যাপার! আর এই সমাজে এমন বাচ্চা জন্ম দেওয়ার কথা ভাবাই যায় না...কেউ মেনে নেবে না।

আমি রাজি হলাম। মানুষের হাতে সব ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতা সবসময় থাকে না, একটা না একটা দিকে ছাড় দিতেই হয়।

৩

তিনদিন পরে স্ক্যান করার জন্য হাসপাতালে এসেছি। এবার সাথে সুমনও আছে। রিপোর্ট ঠিকঠাক থাকলে আজই অ্যাবোর্ট করে ফেলবো। কিন্তু হাসপাতালে আমার জন্য এতো বড়ো চমক অপেক্ষা করছিলো কে জানতো।

আমার রিপোর্টে দেখাচ্ছে আমি প্রায় ছ'মাসের গর্ভবতী! সুমনকে সাথে দেখে নার্স ধরেই নিয়েছে যে আমরা বিবাহিত। হেসে হেসে বললো, আপনি ছয় মাসের প্রেগন্যান্ট আর আপনি জানেনও না? খুব লাকি আপু আপনে, আমার বাচ্চা পেটে আসার সাথে সাথে এমুন বমি আরম্ভ হইছিলো...

আর কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না আমি। মাথাটা ভো-ভো করছে। মনে হচ্ছে পৃথিবীর সময় থেমে গিয়েছে।

সুমনের দিকে তাকালাম, দেখি ওর চোখেমুখেও থমথমে ভাব। ডাক্তারের চেম্বারে গেলাম আবারও। আজকে তাকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে। আমাদেরকে বুঝিয়ে বললো, প্রেগনেন্সি এন্ড করা এখন আর সম্ভব না, বেশি দেরি হয়ে গেছে। এখন অ্যাবোরশন করলে আমি মারাও যেতে পারি।

এরপর আর কোনো কথা চলে না, তবুও সুমন যতোভাবে পারলো ডাক্তারের কাছে অনুনয়-বিনয় করে অনুরোধ করতে লাগলো। খালি পা দুইটা ধরা বাকি ছিল। কিন্তু ডাক্তার কোনোভাবেই অ্যাবরশন করতে রাজি হলো না। এইসব ধরা পড়লে পুলিশ কেইস নিয়ে টানাটানি।

বাসায় ফিরে আমি পুরো ইন্টারনেট তন্ন-তন্ন করে ফেললাম। পড়ে যা বুঝলাম, এখন আর ওষুধ খেয়ে গর্ভপাতের সময় নেই। টাকাপয়সা দিয়ে যদি কোথাও সার্জারি করা ম্যানেজ করতেও পারি, তাহলে আমার মারা যাওয়ার সম্ভাবনাই সর্বোচ্চ। যদিও আত্মহত্যার কথা অনেকেই ভাবে, কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যু যখন এভাবে চোখের সামনে অপশন আকারে হাজির হয়, তখন সেটা সহজে বরণ করে নেওয়া যায় না। আমার সামনে বিশাল ভবিষ্যৎ পড়ে আছে! এতোদিন কষ্ট করে এই পর্যন্ত এসেছি, কতো স্বপ্ন, কতো প্রত্যাশা! বাচ্চা এখন নিবো না দেখে মারা যাবো - এই পরিণতিটা ঠিক মেনে নেওয়ার মতো না।

কিন্তু আশঙ্কা আর ভয়ে আমি অস্থির হয়ে আছি! মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যাই করে ফেলি! মিতুকে ডাকলাম, ও আমার মাথা থেকে আত্মহত্যার কথা একেবারে ঝেড়ে ফেললো। “জোর করে অ্যাবোরশন করতে গিয়ে নিজের জীবন

দিয়ে দেওয়া কোনো সমাধান হতে পারে না। সুমনও এই পরিস্থিতির জন্য ইকুয়ালি দায়ী। তুই এতো স্যাক্রিফাইস কেন করবি? তোর লাইফটা কেন নষ্ট করবি?”

আমি অসহায়ের মতো মিতুর মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম। ও বললো, “এখন বিয়েই একমাত্র পথ।”

৪

সুমনকে বিয়ের কথা বলতেই ও বিগড়ে গেলো। কোনোদিন ও আমার সাথে রাগ করে কথা বলে নি, কিন্তু দুইদিন বিয়ের কথা বলতেই ওর নম্রতার মুখোশ কোথায় চলে গেলো! জানু, বেইবি, সুইটহার্ট ছাড়া আগে কথাই বলতে পারতো না, আর এখন দুনিয়ার যেকোন গালি দিয়ে কথা বলতেও বাঁধে না।

প্রথমে আমি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, এও কি সম্ভব! আমি হয়তো নিজেকেও অবিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু সুমন যে এভাবে বদলে যাবে কোনোদিন ভাবতেও পারিনি। মিতুই ঠিক বলেছিলো, ছেলেদেরকে কোনো বিশ্বাস নেই। কিন্তু আমি সুমনের ভালোবাসায় বিশ্বাস করেছি। ওকে বিশ্বাস করে নিজের সমস্ত ওর কাছে সঁপে দিয়েছি। কখনও মনে হয় নি আমি ভুল কিছু করছি। তাহলে কি সত্যিকার ভালোবাসা বলে কিছুই নেই? আমি কি ভালোবেসে, বিশ্বাস করে ভুল করলাম?

সুমন ইদানিং আমার ফোনও এভয়েড করছে। কয়েক দিন আগে ওর সাথে দেখা হয়েছিল। ও খুব ঠাণ্ডা মাথায় বলেছে, ঠিক আছে, বাচ্চা অ্যাবোর্ট করতে না পারো, জন্ম দাও, এরপর মেরে ফেলো। লাগলে বইলো, আমি কোথাও ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো....

সুমনের কথা শুনতে ঘৃণায় গা রি-রি করছে। অপমানে চোখ জ্বলছে। তবুও কাঁদতে কাঁদতে মানানোর অনেক চেষ্টা করলাম। আমার দায়িত্ব নেয়ার কথা বলতেই ওর সমস্ত ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো।

"একই কথা নিয়ে বারবার প্যানপ্যান করবা না। আমার ডিসিশন জানায় দিছি, এখন আমার পক্ষে বিয়ে করা পসিবল না। ইফ ইউ ওয়ান্ট উই ক্যান বি লাইক বিফোর: বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড। দ্যাটস ইট!"

কতো সহজেই এসব কথা বলে দিতে পারে একটা ছেলে! অথচ একটা মেয়ে—কতো বড়ো দুর্যোগের মধ্য দিয়ে যায় সেটা কি কল্পনাও করতে পারে? আমি বুঝে ফেলেছি, এই পরীক্ষা আমার একার। সেদিন রাতটা মনে হচ্ছিলো দুঃস্বপ্নের মতো দীর্ঘ। কাঁদতে কাঁদতে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছি, শরীর-মন একদম অবসন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু এখন নিজের জন্য হলেও বাচ্চাকে জন্ম দিতে হবে। এরপর বাকি চিন্তা। মিতুর সহযোগিতায় বনানির একটা ফ্ল্যাটে সাবলেটে ভাড়া নিলাম। ওর পরিচিত কয়েকজন সিনিয়র আপু আর জুনিয়র ছাত্রী একসাথে থাকে। বাবা-মা'কে বানিয়ে বললাম, ছাত্রী হোস্টেলে থাকতে হবে পরীক্ষার জন্য, অনেক পড়াশোনা - বাসায় বসে একা একা ম্যানেজ করতে পারছি না।

এর পরের কয়েকটা মাস গেলো বিভীষিকার মতো। জামাকাপড় ঢোলা করে বানিয়ে নিলাম, যেন পেট বোঝা না যায়। ছয় মাসের পর থেকে পেটটা আস্তে আস্তে বড়ো হচ্ছিল। আমি নিদেনপক্ষে বাইরে বেরোতাম না, পরিচিত কারো নজরে পড়তে চাই না। একান্তই বের হওয়া লাগলে গায়ের ওপর শীতে পড়ার একটা বড়ো খদ্দরের চাদর জড়িয়ে নিই। বাসার আপুদেরকে মিতু আগে থেকেই সব বলে রেখেছিল। মৌমিতা আপু, রোকসানা আপা আর রাহেলা। ওরা সবাই অনেক কেয়ারিং, অনেক ফ্রেন্ডলি! আমার পাশে ওরা যেভাবে ছিল, কোনোদিনও সেই ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না!

এদের মধ্যে মৌমিতা আপু আর রাহেলাই বেশি করেছে, বিশেষ করে রাহেলা। এই মেয়েটা এতো লক্ষ্মী আর হৃদয়বান! রোকসানা আপুও যখন যা পারতো করতো। কিন্তু চাকরি নিয়ে ব্যস্ততার কারণে বেশি সময় দিতে পারতো না। রাহেলা মেয়েটা বাসার বাকিদের চেয়ে আলাদা, বয়সেও আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জুনিয়র। প্রচণ্ড গরমেও দেখি কালো একটা বোরকা, নিকাব, হাতমোজা, পা মোজা ছাড়া বাইরে বেরোয় না। কে বলবে বাসার মধ্যে এই মেয়েটাই সবচেয়ে উচ্ছল! ওকে না চিনলে এরকম একটা বোরকাওয়ালি মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করার কথা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতাম না! এতো তফাত আমাদের মধ্যে!

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার গরম লাগে না?

- খুব লাগে!

তাহলে এতোকিছু পরে জোকার সাজো কেন?

রাহেলা হাসতে হাসতে জবাব দিলো, আল্লাহকে ভালোবাসি আপা, তাই আল্লাহর জন্য কষ্ট করতেও ভালো লাগে।

ওর উত্তরটা শুনে একটু থতমত খেয়ে গেলাম। হায় ভালোবাসা! এই ভালোবাসার জন্য আমিও কতো কী করেছি! কিন্তু রাহেলার কথায় যুক্তি আছে, ভালোবাসলে সবই করা সম্ভব। মানুষ শরীর-মন সব বিকিয়ে দেয়, আর একটা কাপড় পরা আর এমন কী। আসলেই আগে ব্যাপারটা এভাবে ভেবে দেখি নি..

প্রায় রাতেই মাঝরাত পর্যন্ত আড্ডা বসতো, সেদিনও আড্ডা বসেছে। রোকসানা আপু বললেন, আমি বাবা-মায়ের কথা ছাড়া এক পাও এদিক-সেদিক করবো না। পড়াশোনা

কম্প্লিট, চাকরি পেয়েছি ব্যাস। আমার ইচ্ছা সমাপ্ত। এখন আব্বা-আম্মা যেই পাত্রের সন্ধান আনবেন, সেখানেই কবুল।

মৌমিতা আপা সবচেয়ে মডার্ন। বলে উঠলেন, সুপাত্রই যে আনবেন তার নিশ্চয়তা কী? তুমি বড্ড বেশি আইডিয়াল চাইল্ড রোকসু...আমি তো হাসানকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ের কথা ভাবতেই পারি না! আর যাকে ভালোবাসি না, তার সাথে সংসার! ইম্পসিবল! হাসান হচ্ছেন মৌমিতা আপার ফার্স্ট লাভ - পাঁচ বছরের প্রেম, এখন পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় চলছে সবকিছু। কিন্তু আমার এখন আর এইসব ফার্স্ট লাভ, দীর্ঘদিনের প্রেম-ভালোবাসায় বিশ্বাস নেই। সুমনও আমার ফার্স্ট লাভ ছিল, আমাদের মধ্যে কোনো সমস্যাও ছিল না। তবুও ...

চিন্তার সুতো কেটে দিয়ে রাহেলা বলে উঠলো, আপুরা আমার চিন্তাভাবনার সাথে তোমার মিল হবে না জানি। কিন্তু আমি বিয়ের পরের ভালোবাসাতেই বিশ্বাসী। যে ছেলেটা বিয়ের আগেই একটা মেয়ের সুন্দর চেহারা আর শরীর দেখে ফেলেছে, সে আসলে ঠিক কোন কারণে মেয়েটাকে ভালোবাসলো কোনো চিন্তা করতে পারো, সৌন্দর্য্য নাকি মেয়েটার মানসিকতা? তাছাড়া আমার সাথে প্রেম করার অর্থ অন্য কোনো মেয়ের সাথেও সে রিলেশন করতে পারতো, আমি বিয়ের পর তাকে কীভাবে বিশ্বাস করবো?

তাহলে তুমি বিয়েটা করবা কীভাবে? এটা তো রোকসানার মতোই হলো, অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ। বাপ-মা ধরে বেঁধে একটা গাধা এনে দিলেও মালা পরিয়ে দিবে??

মৌমিতা আপুর খোঁচাটা গায়েই মাখলো না রেহালা। উল্টো প্রশ্ন করলো, যে ছেলেটা প্রেমিক হিসেবে অসাধারণ, সে যে স্বামী হিসেবেও দায়িত্ববান হবে - এটা কীভাবে বোঝা যায় আপু? **দুনিয়ার প্রত্যেকটা ছেলের সাথে এক এক করে প্রেম করে দেখা তো সম্ভব না যে কে বেশি ভালো, কাকে হাজবেন্ড হিসেবে চুজ করা উচিত**। পাত্রের

ব্যাপারে আল্লাহর গাইডলাইনস ফলো করবো, আমার বাবা-মা অনেক ভালো হলেও উনারা আমার মতো করে সবকিছু দেখেন না, আমি বড়োলোক কোনো ছেলেকে বিয়ে করলেই সবাই খুশি। কিন্তু আমি চাই পরহেজগার কাউকে বিয়ে করতে। তাই এখন থেকেই মসজিদের ইমাম, পরিচিত বড়ো ভাই আর বোনদেরকে বলে রেখেছি যেন এমন কোনো পাত্রের খোঁজ পেলে আমাকে জানায়। আপু, ইসলামে ডেটিং বলে কিছু নেই, কিন্তু বিয়ের আগে জানাশোনার কথা বলা আছে। ডেটিং-এ তো আদর-আহ্লাদ ছাড়া কোনো কাজের কথা হয় না। বিয়ের জন্য যেসব প্রশ্ন জানা জরুরি, সেগুলো জানতে দুজন মিলে একাকী বদ্ধ-কেবিনে হাত ধরাধরি না করলেও হয়। আমি আমার বাবার সামনে বসেও সেই প্রশ্নগুলো জেনে নিতে পারি, যেগুলোর উত্তর শুনে আমি আমার ফিউচার হাজবেন্ড বাছাই করবো।

রাহেলার কথাগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম আমি। প্রতিটা কথাই সঠিক। প্রতিটা কথাই যুক্তিসঙ্গত। অন্তরের গহীনে এসে কোথায় যেন কড়া নাড়ে।

৫

রাহেলা আমার ওপর বেশ প্রভাব ফেলছিল। একদিন বাইরে যাওয়ার সময় ওর থেকে চেয়ে একটা বোরকা নিলাম। মিতু, আমার বান্ধবী, মাঝে একদিন এসেছিল। আমার বোরকা ধরার কাহিনি শুনে চোখ কপালে তুলে বললো, কীরে হুজুর হয়ে গেলি নাকি? আমি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জা পেয়ে বললাম, না, না, পেটটা বড়ো হয়ে যাচ্ছিলো। আসলে পেট বড়ো হয়ে যাওয়াটাই একমাত্র কারণ ছিল না, কিন্তু কেন যে মুখ ফসকে মিথ্যে কথাটা বের হয়ে আসলো! বাসার বাকি সদস্যরা ধরেই নিলো পেট ঢাকার জন্যই বোরকা পরে বেরোচ্ছি। অবশ্য ওদের এই ভুল দ্রুতই ভাঙতে যাচ্ছিল...

দেখতে দেখতে ডেলিভারির দিন ঘনিয়ে আসলো। আমার মাথার মধ্যে দুঃস্বপ্নও চেপে বসতে লাগলো। কী করবো এই বাচ্চাকে নিয়ে? কোথাও ফেলে দিবো? নাকি মেরে

ফেলবো? ভালোবাসার এই চিহ্ন এখন আমার জন্য অভিশাপের চিহ্নে পরিণত হয়েছে। একে কোথাও পুঁতে ফেলতে পারলে আমার শান্তি লাগতো। কিন্তু মাঝেই মাঝেই বেয়াড়া মা-বোধটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রাহেলার দেখাদেখি আমিও নামাজ ধরেছি। ফজর বাদে বাকি চার ওয়াক্ত-ই নিয়ম মতো পড়ছি। ফজরে রাহেলা ঠেলেঠুলে উঠিয়ে দেয়, ও না ডাকলে উঠতে পারিনা। গত আড়াই মাস বাসায় যাই নি, এই দুর্দিনে মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। যদিও আমি মায়ের সাথে তেমন ক্লোজ না, তবু তো মা! আজকাল মায়ের জন্য মনটা খুব আনচান করে।

এমন বিপদের মধ্যে হঠাৎ একদিন সুমনের ফোন এলো। বেশ সাধারণ ভাবে কথা বলছিল ও। আমিও এতোদিনে নিজেকে সামলে নিয়েছি। আগের মতো কান্নাকাটি আর করলাম না, নিজেকে আর কতোই বা নিচু করবো। শীতল স্বরে শুধু বললাম, বলো কী বলবে। আমার গলার আওয়াজেই বোধ হয়, ও বেশি কিছু বলার সাহস করতে পারলো না। শুধু বললো, যদি কোনো দরকার হয় ডেকো। আমার পরিচিত এতিমখানার লোক আছে, সে ব্যবস্থা করতে পারবে। যদিও আমাদের জন্য এই বাচ্চার কোনো সাইন না রাখাটাই বেস্ট।

আমার মাথায় ধাই করে রক্ত চড়ে গেলো। কতো বড়ো দুঃসাহস যে আমাদের কথা বলতে এসেছে। দায়িত্ব নেবে না, আবার দেখাতে এসেছে সে আমাদের ব্যাপারে কতোই না চিন্তিত! কী পেয়েছে এই পশুটা? আমার বাচ্চার কোনো দায়িত্ব তো নেয়ই নি, এখন এসেছে আমার বাচ্চাকে খুন করতে! তোমার থেকে আমি কোনো অ্যাডভাইস চাই নি, বলে মুখের ওপর ফোনটা খট করে কেটে দিলাম।

এতোদিন মনের মধ্যে যা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল এখন সেটাও দূর হয়ে গেলো। এই বাচ্চা আমার বাচ্চা। ওকে আমি মেরে ফেলতে পারি না, না-না-না। আমার মন কিছুতেই সায়

দিচ্ছে না। এই শিশুকে মেরে ফেলা হবে ঘোরতর পাপ। এক গুনাহর ভার এখনও বইছি, সন্তান-হত্যা করে আরেকটা জঘন্যতম অপরাধের ভাগীদার আমি হতে চাই না।

কিন্তু কোথায় যাবো এই শিশু নিয়ে, কী করবো? বাবা-মায়ের সামনে কী জবাব দেবো? মিতু, রাহেলা, রোকসানা আপু, কেউই সন্তোষজনক কোনো সমাধান দিতে পারলো না।

জীবনের এক একটা পর্যায় এতো জটিল, যার সমাধান কোনো মানুষের কাছেই থাকে না। রাহেলা শুধু বললো, আপা, দুয়া করেন। আপনি আল্লাহর দিকে পা বাড়াইসেন, আল্লাহ আপনাকে কখনও ফেলে দিবে না।

আমি শুধু দুয়াই করলাম। ফজরের নামাজ এখন নিয়মিত পড়ি। রাতের বেলা ঘুমও আসতে চায় না এখন আর, তীব্র ব্যাকপেইন আর মাথাব্যথা নিয়ে জেগেই থাকা হয়। ভোর রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি আর আল্লাহর দরবারে দুয়া চাই। বাচ্চাটাকে মারতে চাই না ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা করে দাও। ঘুরেফিরে এই একই দুয়া পাগলের মতো চাইতে থাকি.....

৬

আমার পরিবর্তন দেখে ধীরে ধীরে সবাই বুঝে যাচ্ছিলো যে আমি সাময়িক বোরকা ধরি নি, আসলেই বদলে গেছি। আরও পরিষ্কার হলো যখন দেখলো আমি কিছুতেই পুরুষ ডাক্তারের কাছে অপারেশন করাতে রাজি নই! মিতু তার চিরাচরিত স্বভাবমত একটা লম্বা ঝাড়ি দিয়ে বললো, মরতে চাস নাকি? বয়ফ্রেন্ডের সাথে রাত কাটাতে খারাপ লাগলো না, ডাক্তারের কাছে অপারেশন করাতে যতো লজ্জা।

মিতুটার মুখে কিছুই বাধে না। আমি দাঁতমুখ চেপে বললাম, দ্যাখ, সবকিছু মিলাস না। আগে এতো মেনে চলতাম না। পুরুষ ডাক্তারের কাছেও অপারেশন করবো যদি আর কোনো অপশন না থাকে। কিন্তু মহিলা ডাক্তারের খোঁজ করতে তো আর সমস্যা নেই। তুই পারলে আমাকে হেল্প কর—এতো ক্যানক্যান করিস না। মিতু ঠোঁটকাটা হলেও অবিবেচক না। আমাকে আর বেশি ঘাটালো না।

বললো, চল ঘুরতে যাই। উদ্দেশ্য শপিং! বাচ্চা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে এখন মনটা বেশ ভারমুক্ত লাগে। শখও হয় অনেক রকমের। কিন্তু ভারি শরীর নিয়ে বেরোনো হয় না। মিতুই আমাকে টেনে বের করলো ঘর থেকে। ছোট্ট সোনার জন্য ফিডার, জামা, জুতো, একটা ছোট্ট বালিশ, কয়েক প্যাকেট ডাইপার, আর রেডিমেড কাঁথা কিনে আনলাম। সেই দিনটা কী যে ভালো লাগছিলো! মা হওয়ার ব্যাপারটা যে এতো আনন্দদায়ক এতোদিন উপভোগই করতে পারি নি। শুধু দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনা আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিলো। কিন্তু এখন চিন্তা হলেই মনে মনে বলি, "হাসবি আল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল" আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, এরচেয়ে মন ভালো করা কথা আর আছে কোথাও?

ডিউ ডেইটের প্রায় তিন সপ্তাহ আগেই আমার ব্যথা শুরু হয়ে গেলো। অস্বাভাবিক ব্যথা! আমাকে দৌড়ে ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেলো রাহেলা আর রোকসানা আপু। মিতুও এলো কিছুক্ষণের মধ্যে। মাঝের পুরো তিন ঘণ্টা আমার কোনো হুঁশ ছিল না।

হুঁশ ফিরে শুনলাম, আমার ডেলিভারি হয়ে গেছে। জ্ঞান ছিল না, তাই সিজার করে বাচ্চা বের করা লেগেছে। আর সবচেয়ে আকস্মিক, সবচেয়ে ভয়ংকর, সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক খবরটা আমাকে ঠিক তখনই দেওয়া হলো। আমার বাচ্চাটা মারা গেছে। ব্রেইন হ্যামারেজের কারণে ডেলিভারির সময়ই ও মারা যায়।

আমি জমে গেলাম। অপ্রত্যাশিত হলেও বাচ্চাটাকে নিয়ে শেষপর্যন্ত অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম। সব প্রতিকূলতার মধ্যে ওকে জন্ম দিয়েছি, পুরো পৃথিবীর সাথে যুদ্ধ করে হলেও ওকে ভালোমত বড়ো করতে চেয়েছি। আমার মনের কুঠিরে জায়গা করে নিয়েছিল পাখিটা। চলে গেলো এভাবে? আমাকে একা ফেলে রেখে? খুব কষ্ট হলো, এই কষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তীক্ষ্ণ একটা বেদনা আমাকে চিরে ফেললো।

অথচ অদ্ভুত পৃথিবী, এই ভয়ঙ্কর দুঃসময়ে কয়েকটা অবিবাহিত মেয়ে ছাড়া আমার পাশে আর কেউই নেই। এরা কী বুঝবে আমার কষ্ট! ছাদের দিকে চোখ চলে গেলো। আল্লাহকে ডেকে বললাম, হে আল্লাহ তুমিই সবচেয়ে উত্তম অভিভাবক। আমার বাচ্চাটাকে তুমি দেখে রেখো।

৭

রাস্তার ধারের কোনো ডাস্টবিনে না, নর্দমার বর্জ্যতে না, টয়লেটে ফ্লাশ করেও না— আমার সন্তানকে আমি সবচেয়ে সুন্দরভাবে বিদায় জানালাম। হুজুর ডেকে ওর দাফন সম্পন্ন হলো, আমি বাদে বাকিরা সবাই নামাজ পড়লো। যে শিশুর মৃত্যু লেখা আছে, সে মারা যাবেই। বাবা-মা হয়ে নিজের হাতে সন্তানকে খুন করা তো জানোয়ারও পারে না। আর মানুষ শরীরের ক্ষুধা, প্রেমের তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে শেষমেশ সেটাই করে...

এক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকার পর আমি বাসায় ফিরে গেলাম। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে রিকাভার করতে অনেক সময় লাগছিল। বাসা থেকে মিতু বুদ্ধি করে আগেই বাচ্চার জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলেছে। যেন আমার চোখে পড়লে আমি দুঃখ না পাই, অবশ্য এতোকিছুর দরকার ছিল না। আমি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখি আর আল্লাহকে মেনে চলি। এখন আমার সাথে যেটাই হোক, আমি আর ভয় পাই না। ভেঙেও পড়ি না। রোকসানা আপু বদলি হয়ে গেছেন শুনলাম, আমারও এই বাসা

থেকে বেরোনোর সময় হয়ে গেছে। নিজের বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যেতে হবে এবার...

মনে হলো যেন একটা যুদ্ধ শেষ হলো। কিন্তু ফিরতে হলো খালি হাতে। আসলে খালি হাতে না, হাতে ইসলামের আলো নিয়ে ফিরছি - এটাই তো সবচেয়ে বড়ো পাওয়া!

বাসায় বাবা-মা আমাকে প্রায় তিন মাস পর দেখছেন। আমার পরিবর্তনে খুব হতবাক সবাই। যেন আমাকে চিনতে পারছে না কেউ।

এর প্রায় দুই মাস পরে হঠাৎ একদিন সুমন ফোন দিয়েছিল। গলা শুনে মনে হলো যেন খুব কান্নাকাটি করেছে। ভেক ভেক করে হেঁচকি তুলে আমাকে বললো, সে 'মেইক আপ' করতে চায়! যতো সব ভণ্ডামি। পুরো প্রেগন্যান্সির সময় আমাকে মাঝ সমুদ্রে ফেলে দিয়ে এখন এসেছে আবার আমার শরীর এনজয় করতে! মানুষই পারে এতোটা নির্লজ্জ হতে।

আজ ভাবছিলাম, আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন। পৃথিবীর প্রতিটা ঘটনার পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। এক একটা পরিস্থিতি তৈরি করে তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর কাছে আসার সুযোগ করে দেন। **কেউ সেই সুযোগটা কাজে লাগায়, আর কেউ ছুঁড়ে ফেলে**। প্রথমে বাচ্চা রাখার কোনো ইচ্ছাই ছিল না, অথচ বাচ্চা জন্ম দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না। এরপর আল্লাহর ভয়ে বাচ্চাটা রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন আল্লাহ অন্য ইচ্ছা করলেন। আর একদিক থেকে ভাবলে এভাবেই আল্লাহ আমাকে বেইজ্জত হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। মাঝখান দিয়ে সুমন আর সুমনের মতো সব ছেলের চেহারা স্পষ্ট করে দিলেন। বিয়ের আগে প্রেমগুলো কতো সস্তা, কতো ঠুনকো, কতো মেকি! অথচ ছেলেমেয়েরা অন্ধের মতো এর পিছেই ছুটতে থাকে...

মিতু এখনও আগের মতোই আছে। কিছু মানুষ কখনোই শিক্ষা নেয় না। আমার এতো বড়ো ঘটনার পরেও ও ঠিক আগের মতো রয়ে গেলো। ছেলে ঘুরিয়ে মজা নিচ্ছে। খোলামেলা ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন যার সাথে ইচ্ছা শুয়ে পড়ছে। ওর সাথে আগের মতো আর মিশতে পারিনা, বন্ধুত্ব আছে কিন্তু অশ্লীল রসিকতা নেই। ছেলেদের সাথে বসে আড্ডা দেই না দেখে দেখাসাক্ষাতও কম হয়। রোকসানা আপুর খবর অনেকদিন জানিনা। তবে মৌমিতা আপুর কথা মিতুর মুখেই শুনেছি, পাঁচ বছরের সেই ফার্স্ট লাভকে ছেড়ে তিনি কানাডার আরও উচ্চশিক্ষিত এক পাত্রকে বিয়ে করে এখন কানাডায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হায়রে ফার্স্ট লাভ! হায়রে মরার প্রেম!
রাহেলার সাথে বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়েছে। যদিও ও আমার ছোটবোনের মতো। সামনের মাসে ওর বিয়ে। ছেলে ছাত্র, একই সাথে ব্যবসাও করছে। কম বয়সেই বিয়ে করতে চায়, রাহেলার দ্বীনদারিতা দেখে ওকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। রাহেলা বলে, একবার বিয়েটা করি, এরপর বরের সাথে মিলে তোর ঘটকালি করবো... হি হি।

আমি অনেক বদলে গেছি। অ-নে-ক। এখন রাহেলার মতোই হাত মোজা-পা মোজা পরি।

দূর থেকে দেখে একদিন মিতু বলেছিল, “তোকে দেখে ভেবেছি রাহেলা কী করে এইখানে! সো কনফিউজিং!”

আমি মনে মনে হাসি। আল্লাহ আমাকে অনেক দিলেন।

এক জীবনে আল্লাহকে খুঁজে পেলে আর কী চাওয়ার থাকতে পারে.....

প্রেম-বিয়ে সংস্কৃতি এবং অসুস্থ দুষ্টচক্রগুলো

প্রেম-ভালোবাসা এবং বিয়ে বিষয়ে আমার সাধ্যমতন কিছু অতি স্বল্প আকারে লেখা লিখেছিলাম একসময়। স্রেফ এতটুকুর কারণেই অনলাইনে এবং বাস্তব জীবনে বিভিন্ন তীর্যক তীক্ষ্ণ ভাষায় কটুক্তি ও সমালোচনা আমি শুনেছি। কিছু কথার কারণে কষ্টও পেয়েছিলাম। সে যাই হোক, আমি জানি, এই বিষয়টাতে আমি কেন বারবার গুরুত্বপূর্ণ বলতে চেয়েছি। কেবল ইচ্ছে হলেই লিখতে বসিনি, অনেক সময় নিয়েই ভেবে কথাগুলো বলতে চেয়েছি কেননা আমার জীবনের বেড়ে ওঠার সময়গুলোর অভিজ্ঞতার আলোকেই কিছু কথা জানাতে চেয়েছি। আমি প্রচুর মানুষের সাথে মিশেছি সবসময় হাইস্কুলের সময় সময় থেকেই — আমার তা ভালো লাগত। আমি ভার্সিটি লাইফে কখনো হলের বাইরে কাটাইনি, মিশেছি, জেনেছি, সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করেছি। আমার এই দীর্ঘ সময়ে উপলব্ধি ছিলো বেশ কিছু যার একটি হলো — তরুণ প্রজন্মের আনপ্রোডাক্টিভিটি, সময় নষ্ট করা, দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়া, মেধা কমে যাওয়ার পেছনে যেই জিনিসটাকে আমার খুব বড় মনে হত তা হলো — প্রেম।

কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, চলমান সময়টা বড্ড কঠিন। পূর্বেকার অন্য যেকোন সময়ের চাইতে কঠিন, আগামীতে আরো বেশি ফিতনাময় হবে তা বলাই যায়। এখন যারা দ্বীনের বোধসম্পন্ন মানুষ, তারা অনেক চিন্তিত থাকেন একটা সন্তানের বেড়ে ওঠা নিয়ে নিয়ে এবং আল্লাহর কাছে অনেক বেশি করে দু'আ করে সাহায্য চাইতে থাকেন; এটাই স্বাভাবিক। আমি ক্লাস এইট পেরিয়ে যেসব বিষয় ক্লাসমেটের কাছে শুনে অবিশ্বাস নিয়ে ভয়ে শিউরে উঠে রাতে ঘুমাতে পারিনি, সেসব বিষয়ে এখনকার কিন্ডারগার্টেনের ছেলেমেয়েরাই দিব্যি তা জানে। মনে পড়ে, 'আলিফ লায়লা' দেখবো বলে এশার সলাতে (৮:৩০/৮:৪৫) সালাম ফিরিয়ে দৌড়ে বাসায় ফিরতাম। তখন জুঁই নারিকেল তেলের অ্যাডে বলত, 'তোমার ঘন কালো চুলে হারিয়ে যায় মন' — এমনটা দেখেও লজ্জা পেতাম। একটা ছেলে এরকম বেশরমের মতন কথা বলছে,

চিঠি লিখছে তা মানতে পারতাম না, জানতাম এটা ঠিক নয়। আল্লাহর অশেষ রাহমাতে টেলিভিশনের প্রতি ন্যূনতম ভক্তিও উঠে গিয়েছিলো ক্লাস সেভেন-এইটের সময়েই। এই জীবনে দিব্যি টিভির দর্শন ছাড়াই খুব ভালোভাবেই বেঁচে আছি আলহামদুলিল্লাহ। ক'দিন আগে পন্ডসের অ্যাডে দেখলাম বলে "এমন নরম কোমল ত্বক শুধু ছুঁতে চায় মন" — এমন টিভি কমার্শিয়াল ভাতিজি এবং ভাগ্নের সামনে বসে দেখা খুবই অস্বস্তিকর। তাও ভালো, স্যাটেলাইট চ্যানেলে ডিওডোরেন্ট স্প্রে-গুলোর টিভি কমার্শিয়াল দেখার মতন অসভ্য বিষয় দেখতে হয়নি, পানাহ চাই আল্লাহর কাছে।

আমি জানিনা কয়টা পরিবার আদৌ 'ডিশের লাইন' ছাড়া টেলিভিশন কল্পনা করতে পারেন। তবে, আমি জানি, আমি এবং আমাদের ভাই-বোনদের টেলিভিশনের তেমন কোন উপস্থিতি ছাড়াই দিব্যি জীবন কেটে গেছে, এবং তা অবশ্যই চাপিয়ে দেয়া ছিলো না, এগুলোর প্রতি আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিরক্তিবোধ থেকেই তা হয়েছিলো। ক্রমাগত লজ্জাহীনতা দেখতে থাকলে, একসময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে, অথচ এসব স্বাভাবিক না। 'টম এন্ড জেরি' কার্টুনে টম কোন বিড়াল পেলেই যেই অঙ্গভঙ্গি করে এগিয়ে যায়, তা বোধকরি হলিউডের বড়দের 'এজ রেটের' ফিল্মগুলোর সাথেই মানায়, এতে মেয়ে বিড়াল অথবা নারী কারোই পোশাক গ্রহণযোগ্য নয়। প্রায় কার্টুনগুলোই এমন। আমাদের কি মনে হয় শিশুরা এসব বুঝেনা বা শিখেনা? তাদের 'অবজার্ভেশন পাওয়ার' অত্যন্ত বেশি সেটা মা-বাবা মাত্রই জানেন। সিনডারেলা, মিনি এবং মিকি মাউসের মূল চরিত্রগুলোতে 'স্ট্যান্ডার্ড' বা শিক্ষণীয় বিষয় কতখানি ভেবে দেখি আমরা? ইসলামের চোখে এই নির্লজ্জ এবং আদবহীন বিষয়গুলোর প্রসার করা তো সম্পূর্ণ নিষেধ। সন্তানদের কাছে এই পথগুলো খুলে দিলে একসময় তারা 'ডিসেনসিটাইজড' হয়ে যাবে। তাদের সামনে আদর্শের অভাব হয় কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের সেরা চরিত্র তাদের কল্পনায় আর গল্পে জীবন্ত থাকছে না। কিন্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমরা তাদের

দিয়ে রাখি কম্পিউটার বা টেলিভিশন পর্দায় চরিত্রহীনতার প্রদর্শনীতে। ওতেই ভয়, কেননা যখন 'খারাপ/অস্বাভাবিক' বিষয়গুলো 'স্বাভাবিক' হিসেবে প্রকাশ পাবে ছোটদের কাছে, তখন তার প্রতি ওদের অপছন্দ ও ঘৃণা তৈরি হবে না। ভবিষ্যত চরিত্রে তার প্রভাব থাকবে। আমাদের দ্বীনে 'হায়া' বা লজ্জা অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যা কেবল উপলব্ধিরই নয় বরং সময়ের সাথে সাথে তাকে গড়ে তোলারও।

কলেজ জীবনে এসে খেয়াল করতাম যেই কোচিং সেন্টারে মেয়ে থাকত, সেটাতে অনেকেই পড়তে যেতে চাইত। এখন তো ফেসবুকেই অনেক ফ্রেন্ড বানিয়ে, ইনবক্সের আলাপে, ফটো কমেন্টে কতকিছু হয় যা কেউ ভাবেনি আগে!! সেই সময়ের এই রোমান্সের মূলে ছিলো হিন্দি মুভিগুলো, অথবা হলিউডি মুভি। বন্ধুরা অনেকেই উল্টাপাল্টা প্রেম করতে গেলে যদি দু'কথা বলতাম তখন শাহরুখের 'কাল হো না হো' দেখে শেখা একটা ডায়লোগ দিতো — 'ছাও, মুসকো রাও, কেয়া বাতাও, কাল হো না হো'... এত চিন্তা করে আর কী হবে ক'দিনের এই জীবনে? ভালো কথা, মনে পড়লো যে সেই সময়ের প্রেমিক হৃদয়ের কেউ কেউ বিয়ে করে ডিভোর্সও হয়ে গেছে তাদের বনিবনা হয়নি বলে। চিন্তা করতে শেখার আগেই বড় সিদ্ধান্ত আবেগের বশে নিলে মানিয়ে নেয়া হবে কী করে? এমন কিছু ক্ষতি তো আছেই অপরিণত 'প্রেম করাই লাগবে' রোগের। কলেজে পড়ি তখন, একবার এক বন্ধুর বাসায় ঈদের দিন দাওয়াতে গিয়েছি। বলাই বাহুল্য, উপস্থিত ক্লাসমেটদের প্রায় সবারই 'গার্লফ্রেন্ড' ছিলো। বন্ধুর বড় বোন হঠাৎ হাজির হয়ে সবার 'ইয়ের' খোঁজ নিচ্ছিলেন, আমি অস্বস্তিতে মাথা নিচু করে খাচ্ছিলাম। একসময় আমার কাছে প্রশ্ন এলে আমি কিছু না বললেও বন্ধুরাই বললো। আমাকে তিনি বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কোন ফোন ফ্রেন্ডও নাই?!!" সে অনেক বছর আগের কথা। সেদিন উনার অবাক হওয়া দেখে আমি যেন বিষণ্ণ হয়ে গেলাম, এই 'ফোন ফ্রেন্ড' জিনিসটা আমি পরে অন্যদের জিজ্ঞাসা করে বুঝেছিলাম। এটা হলো — ফোনে আলাপ হবে, মজা হবে, খোঁজখবর নেয়া হবে... !! কী অদ্ভুত সব আবিষ্কার শয়তানী বুদ্ধির লোকেদের।

ভার্সিটি হলে যখন থাকি, তুমুল প্রেমের বন্যা চারপাশে। ক্লাসের শেষে, বিকালে রিকসায় করে কোথাও অনেকেই ঘুরে। একটু রাত হলেই ফোন কানে নিয়ে ছেলেরা হলের বারান্দার দেয়ালে উঠে কথা বলতে শুরু করে। রাত গভীর হয়, ফোনওয়ালার সংখ্যা ও আনাগোনাও বাড়ে। এই সময়ে নিজেকে প্রতিদিন উত্তর দিতে হত, কেন আমি ওদের মতন হতে চাইনা। এটাই মনে হয় সবার হয়, নিজেকে প্রশ্ন করা, উত্তর পাওয়া নিজের ভিতর থেকেই। এমন নয় যে মনের কথা বলা, আলাপচারিতা আর খুনসুটি করার ইচ্ছা কারো হয় না — এ আবেগ সাধারণ, সবার। বেশিরভাগ পরিবারে বিবাহপূর্ব সম্পর্ক প্রেম গ্রহণীয় থাকে না — সেটা ধর্মীয় কারণেই হোক বা পারিবারিক অন্য কারণেই হোক। অথচ ছেলেমেয়েরা অনেকে লুকিয়ে প্রেম করে শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত করে। ৬-৭ বছর পেরিয়ে যায় অথচ বাবা-মা জানতে পারেন না দিব্যি তারা প্রতিদিন কত যোগাযোগ করে। এভাবেই কেউ সম্পর্ক ভাঙ্গে, নতুন সম্পর্ক গড়ে। আর, বিয়ে? সে ত বহুদূর... প্রশ্ন করলে তাদের অনেকের কাছে উত্তর পাবেন, "এখনো আমরা এতটা ভাবছিনা, আরো কিছুদিন যাক। বিয়ে অনেক খরচ আর দায়িত্বের ব্যাপার"... কী যাবে? কতদূর? কেন? দায়িত্ব কী ভীতিকর? আর দায়িত্বহীন আনন্দ? তা কেন নিচ্ছ??

ভার্সিটির হলগুলোতে বহু কম্পিউটারেই পর্ণগ্রাফি পাওয়া যাবে। অনেকগুলো ভার্সিটির কথা আমি জানি, বন্ধু-ছোটভাই-বড়ভাইদের কাছে শুনেছি। এটাও জানি, হলের নেটওয়ার্কে ঢুঁ দিলে শত গিগাবাইটের পর্ণোগ্রাফির মুভিওয়ালা ছেলেরাও দিব্যি ফেসবুকে বসে বসে 'নারীমুক্তির' গান গায়। নারীর প্রতি এদের ধারণা তারা নারী নিয়ে আলাপ করার সময় যা বলে, তা থেকেই সহজে অনুমেয়। হলের টিভিরুমে 'চিয়ার গার্ল' অথবা 'সুন্দরী মডেল' দেখালে যারা সর্বপ্রথম কিছু রগড়গে মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়, এই 'মুক্তমনারা' সে দলেই পড়ে। সাইবার ক্যাফে তে অনেক আগে যেতাম, যখন নিজের মডেম ছিলো না — সেখানে 'ব্রাউজারের হিস্টরি' ঘাঁটতে হত না, অ্যাড্রেসবারে কিছু চাপলেই ভীতিকর হয়ে বেরিয়ে আসত। প্রকৌশলবিদ্যার ছাত্র হবার কারণেই হয়ত,

একটা কম্পিউটারে বসে কয়েক সেকেন্ডের মাঝে অনেক কিছু বুঝে ফেলতে পারি। মনে আছে, আগের অফিসে থাকতে 'প্রভার ভিডিও' বের হবার পরে "সকল বিবাহিতরা" দৌড়ে অপর বিবাহিতের কম্পিউটারে দেখতে গিয়েছিলো। কেউ দেখাচ্ছে, কেউ দেখতে যাচ্ছে। তারাই আবার 'ছি ছি' করলো পরে। এমন নির্লজ্জতা সহ্য করা কঠিন! কিন্তু এমনটাই মনে হয় বাস্তবতা। বছরের পর বছর ধরেই এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। অনেক বয়স্করা অফিসের ইন্টারনেট ইউজ করে এসব ডাউনলোড করেন — তারা সন্তানের জনক। জানতে পেলে লজ্জা পাই, উনাদের হয়না। এক বাসায় গিয়ে ল্যাপটপে একটা কাজ করে দিতে ধরতেই দেখলাম এর আগেই কিছু পর্ণ সাইটে ঢুঁ দেয়া হয়েছে। এমন অভিজ্ঞতা অজস্রবার হয়েছে নানান জায়গায়...

এমন একটা ভয়াবহতাময় কঠিন সমাজেই আমাদের বসবাস। এখানে বাস্তবতাগুলো জেনে, বুঝেও এই নোংরা আর ধ্বংসের স্রোতের বিপরীতে যারা জীবনধারণ করতে চান, তারা স্বপ্নবাজ মানুষ। তারা অন্তরে আলো জ্বেলে সেই আলো ছড়িয়ে দিতে চান। তারা সচ্চরিত্র হতে চান, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা মানুষ নন। ইসলামের সবখানেই বিয়েকে সর্বাগ্রে রাখা হয়েছে। যেই ছেলেরা দ্বীনেকে আঁকড়ে ধরতে চায়, চরিত্র রক্ষা করতে চায়, চোখকে সংযত রেখে পথ চলে, জীবনকে সাজায় — সে কি তা বছরের পর বছর ধরে করবে? এখানে পরিবারগুলোর চিন্তা করা প্রয়োজন আন্তরিকভাবে। জীবনকে যাপন মানে নিজেরা পরীক্ষাকে জটিল করে ফেলা নয়, যেখানে সহজ সমাধান শেখায় সুন্নাহ, আমাদের সেরা মানুষদের রেখে যাওয়া জীবনাদর্শ। আমাদের আগের প্রজন্মের বাবারা খুব অল্পই ৩০ পেরিয়েছিলেন, মায়ের অল্পই ২৫ পেরিয়েছিলেন। সেই অভিভাবকদের অনেকেই অনেক কিছুর দোহাই দিয়ে সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যত চান বিধায় বিয়েকে পিছিয়ে পিছিয়ে তিরিশের ওপারে নিয়ে গেছেন। নিঃসন্দেহে তাদের নিয়াত সুন্দর, কিন্তু বোধের সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু এই সন্তানরা কেমন সময় অতিক্রান্ত করছে? সন্তানদের নিয়েও কি তারা এই শহরের প্রায়

নগ্ন নারীদের বিলবোর্ড, টেলিভিশন কমার্শিয়াল দেখছেন না? বিষয়টা চিন্তা করার। খুব বড় বিষয়, অবশ্যই ভাবতে হবে বিপদ থেকে বাঁচতে।

আমার এক ছোট ভাই, ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। সুন্দর চরিত্রের এই ছেলেটি নানান রকম ফিতনাহর যন্ত্রণায় জর্জরিত। সামনে কমপক্ষে চার বছরের নীলনদ সাঁতরাতে হবে, এরপর রয়েছে চাকরির বাজারের যুদ্ধ। বাসায় নির্লিপ্ত তো বটেই। শুধু ক্রমাগত রোজা রাখা আর বাসায় আন্তরিকভাবে জানানো ছাড়া সমাধান দিতে পারলাম না। আরো ৬-৭ বছর আগে শারীরিকভাবে যোগ্য হওয়া ছেলেটার হালাল সমাধান যে সুদূরপরাহত সে তো আমি ২৮-২৯ চলতে থাকা মানুষদের দিকে তাকিয়েই জানি! অথচ ইসলাম বলেছে এই সীমানা প্রাপ্তবয়স্ক হলেই হবে। সে তো অনেক আগেই। যে নিজের মনটাকে পবিত্র রাখতে চাইছে, তার জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনী এলে টের পেত এই পবিত্রতা কত সুন্দর আর দারুণ। তারা দু'জনে দু'জনের দুর্গের মতন হয়। পবিত্র জীবনসঙ্গিনী একজন মু'মিনের জন্য দুর্গস্বরূপ, তাকে অশ্লীলতা, অন্যায় থেকে রক্ষা করবে। একজন মুসলিমাহ তার জীবনসঙ্গীকেও অমন করেই পাবেন। তাদের জীবনের কঠিন সময়ে পরস্পরকে সঙ্গী করে পেয়ে তাদের বন্ধন যে আরো সুদৃঢ় হবেই ইনশা আল্লাহ, তা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধি লাগে না। কত সুন্দরই না সমাধান। আর্থিক সমস্যা কখনই অত বেশি মুখ্য নয়, আর সেই সমস্যা কেউ এড়াতেও পারবে না। দু'জনে মিলে সেই জীবনের পথে এগিয়ে গেলেই বরং কল্যাণকর...

পুর্বেকার প্রজন্মের সাথে আমাদের বড় ক্ষতি বিয়ের বয়স পিছিয়ে যাওয়া। এখন তো যারা প্রেম করছে, তারা বিয়ে করবে বলে তা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে, তারাও বিয়ের আগে বছরের পর বছর এই হারাম সম্পর্ক এগিয়ে চলেছে। প্রতিদিনই তারা যিনার পাপে নিজেদেরকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। শেখাবে কে তাদের? আল্লাহর নির্দেশ তো এমন নয়। এখন তো যেন ছেলেরা সবই পারে — ইতরামি, ফাইজলামি, গার্লফ্রেন্ড পালা, ফাস্টফুডে আর পার্কে নষ্টামি, রিকসাথে হুড তুলে বেহায়াপনা; শুধু বুঝি পারে না

বউয়ের দায়িত্ব নেয়ার হিম্মত নিতে। এখন তো পারিবারিক পরিবেশগুলোও আলাদা। মেয়েদের পরিবার চায় অনেক টাকাওয়ালা ছেলে, এতে মেয়ের ভবিষ্যত 'নিশ্চিত' হবে। অথচ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বীনদারীকে সর্বাগ্রে দেখতে বলেছেন, আল্লাহ নিশ্চয়তা দিয়েছেন চরিত্র রক্ষায় বিয়ে করলে তার অভাবকে তিনি মুক্ত করবেন। অন্যদিকে ছেলেরাও দ্বীনদার মেয়ে ভুলে সুন্দরী চায়। অথচ রূপের চটক আর চমক কারই খুব বেশিদিন থাকে না। কিন্তু দু'জন ছেলে-মেয়ে পারস্পরিক চরিত্র রক্ষায় বিয়ের বন্ধনে জড়ালে ইনশাআল্লাহ জান্নাতে তারা অপরূপ হয়ে একে অপরের কাছে ধরা দিবেন। দুনিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধতা আর সেখানে থাকবে না। এই পৃথিবীতে চরিত্র রক্ষার আশায় পরস্পরের 'চাদরস্বরূপ' হয়ে, অন্যের জন্য হালাল ইবাদাত হয়ে ধরে দিলে ইনশাআল্লাহ আগামী প্রজন্মও আসবে সুন্দর ও সুনিপুণ চরিত্রের।

রিযিকের মালিক তো কেবলই আল্লাহ — তিনি তো যাকে ইচ্ছা বেহিসাব দেন। চরিত্রের জন্য বিয়ে করা দম্পতির রিযিককে তিনি প্রশস্ত করে দিবেন, তা তিনি জানিয়েই দিয়েছেন। ভাইয়েরা যেন একজন দ্বীনদার মেয়েকেই খুঁজেন, টেলিভিশনের নায়িকাদের সাথে তুলনা করে স্ত্রী খুঁজতে না যান। সত্যি কথা হলো, আমরা যদি ইসলামিক উপায়ে দৃষ্টি অবনত করে চলতাম, তাহলে যাকেই জীবনসঙ্গী পেতাম — তাকেই আমাদের অপরূপা মনে হত। একজন মুসলিমাহর জীবন অনর্থক সৌন্দর্যচর্চা করে সময় নষ্টের জন্য নয়। মুসলিম ভাইও স্ত্রীকে পার্লারে গিয়ে তার সময়-অর্থ-মানসিকতাকে নষ্ট করতে দিতে চাইতে পারেন না। মুসলিম হিসেবে আমাদের কাজ অনেক বড়। আমাদের উদ্দেশ্য তো সেই নূরকে ধারণ করে চারপাশে ছড়িয়ে দেয়া যেই আলো আমাদের রবের ভালোবাসায় প্রজ্বলিত। আমরা তো ক্ষুদ্র দুনিয়াবী, তুচ্ছ, অর্থহীন বিষয়ে ডুবে থাকতে পারিনা কেননা জানি এই দুনিয়ার জীবন অল্প ক'দিনের। আমাদের লক্ষ্য তো সেই রবের সন্তুষ্টি যিনি সাজিয়ে রেখেছেন অনন্তকালের জীবন -তার প্রিয় বান্দাদের জন্য।

পরিবারগুলোতে সচেতনতা প্রয়োজন। এই সময়ের নষ্ট স্রোতে তরুণ ভাই ও বোনদের দরকার নিজেদের ভেসে যেতে না দেয়া, বরং এই স্রোতকে উলটে দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়া। আমরা তো জানি আমাদের লক্ষ্য কী! আমরা তো অযথা ভেসে যেতে পৃথিবীতে আসিনি। আমরা সেই আল্লাহর দাসত্ব করি, যিনি সৃষ্টি করেছেন জগতের প্রতিটি বস্তু, বানিয়েছেন আমাদের, তার রাহমাতের বর্ষণে আবিষ্ট রেখেছেন আমাদেরকে। আমরা অসহায় আর দুনিয়ার তুচ্ছতায় ডুবে থাকা মানুষদের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দেব — এমনটাই হবে আমাদের স্বপ্ন, হৃদয়ের চাওয়া। আমাদের সামনে আদর্শ তো সেই মানুষটি যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, যিনি সর্বোত্তম আদর্শ; যিনি এই সৃষ্টিজগতের প্রতি রাহমাতস্বরূপ ছিলেন। তার পথ অনুকরণ করে আমরা হবো সমাজের, পরিবারের জন্য রাহমাত। এই ভ্রষ্ট-নষ্ট প্রবাহ নিয়ে ধৈর্যহারা হওয়া যাবে না।

নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের জন্য এই সমাজটাই ঠিক করে রেখেছিলেন, এটাই আমাদের পরীক্ষা, এটাকে বদলাতে হবে, অন্যায়কে সরিয়ে ন্যায়কে, অশ্লীলতার জায়গায় লজ্জাকে, অসুন্দরকে সরিয়ে সুন্দরকে স্থাপন করতে হবে। আমাদের সবর করতে হবে, লেগে থাকতে হবে কাজে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুন্দর একটা সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক-সাংস্কৃতিক শিক্ষার পরিমন্ডল তৈরি করতে হবে। প্রতিটি ভালো কাজের বিনিময় আমরা সাদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে পেতে থাকবো ইনশাআল্লাহ কবরের অন্ধকারে আলো হিসেবে। সময়টা সচেতনতার, দু'আ করার, আন্তরিকভাবে কাজ করে যাওয়ার। এই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মূর্খতা জায়গা করে নিয়েছে। নিজেদেরকে দিয়েই তার পরিবর্তনে কাজ করতে হবে। আল্লাহর জন্য যে প্রাণ কাজ করে, সেইই তো সফল। আমরা এই সমাজে 'গুরাবা', আগন্তুক; আমরা ব্যতিক্রম, ভিন্ন, আমাদের প্রিয় মানুষটি আমাদের কথাই তো বলে গিয়েছিলেন। আমাদের মতন অপর গুরাবাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিন — সাহায্যের, সহমর্মিতার, ভালোবাসার। সাহায্য করুন দুনিয়া নামের বিভ্রমের জায়গায় ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে আর স্বপ্ন জাগিয়ে রেখে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের শক্তি দিন,

সবর করার, যোগ্যতা দিন যেন দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নিজ জীবনে, পরিবারে আর আমাদের সমাজে। নিশ্চয়ই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য আল্লাহকে খুশি করা, তার ইবাদাত করা এবং লক্ষ্য আমাদের জান্নাতের বাগান, যা কেবল শান্তিই শান্তি, যে পরম আনন্দের উদ্যান কেবল মুত্তাকীদের জন্যই। আল্লাহ আমাদের সেখানে যাবার যোগ্য করে দিন।

ক্রাশনামা

১

ফেব্রুয়ারি যখন চলেই এসেছে, ভালোবাসা দিবস নিয়ে যথারীতি হুজুর আর সেকুলাঙ্গারদের মাঝে ক্যাঁচাল তো হবেই। এরই মাঝে হয়তো হুজুর পক্ষের কিছু জেনারেল স্টেটমেন্ট শুনে আঁতকে উঠবে সাধারণ তরুণ সমাজ। যেমন, "তোমরা যেটাকে ক্রাশ খাওয়া বলো, ইসলাম সেটাকে বলে চোখের যিনা।"

আসলে ক্রাশ খাওয়া বলতে যা বোঝায়, তা এমনিতে স্বাভাবিক মানবীয় বৈশিষ্ট্য। বিপরীত লিঙ্গের কোনো সদস্যের প্রতি যে ক্রাশ খায় না, তার অবশ্যই চিকিৎসা দরকার (জন্মগতভাবে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ যারা, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র)। একটা সমাজে সবকটা নারী নেকাব পরলে আর সবকটা পুরুষ ফিলিস্তিনি রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে চললেও ক্রাশের ঘটনা ঘটবে। অ্যারেঞ্জড ম্যারেজে পাত্র-পাত্রী দেখা বা বাসররাতে পরস্পরকে দেখার সময় হলেও মানুষ ক্রাশ খাবে। এখন কথা হলো, তাহলে হুজুররা এই স্বাভাবিক জৈবিক বিষয় নিয়ে এত ক্ষ্যাপা কেন?

কারণ হলো ক্রাশ খাওয়ার সূত্র ধরে হওয়া পরবর্তী কাজগুলো। আর সেসব কাজকে ঘিরে শয়তান আর সেকুলাঙ্গারদের (দুইটা প্রায় একই জিনিস যদিও) উসকানি ও ব্যবসা।

ক্রাশ খাওয়ার পরে কী কী করতে হবে বা করা যাবে না, তা নিয়ে বই লিখে ফেলা সম্ভব। নাম হতে পারে "ক্রাশ খাওয়ার বিধান"। যেমন- বিবাহের সামর্থ্য থাকলে যথাস্থানে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাওয়া, অভিভাবকদের জানানো, খোঁজখবর নেওয়া, আল্লাহর সাহায্য কামনা ইত্যাদি। সামর্থ্য না থাকলে নিজেকে সংবরণ করা, সওম পালন, (এক্ষেত্রেও) আল্লাহর সাহায্য কামনা ইত্যাদি।

সব মিলিয়ে ক্রাশ খাওয়ার পরে বিশাল দায়িত্ব কাঁধে আসে। সেকুলাঙ্গাররা এই পরের অংশটা পুরোপুরি পালটে দেয়। দায়িত্বটুকু বাদ দিয়ে শুধু মজাটুকু নেওয়াকে উৎসাহিত করে। লটরপটর করা, পরস্পরকে চেটেপুটে দেখা, একজন মানুষের টানে প্রয়োজনে পরিবার-সমাজের সাথে শত্রুতা করা ইত্যাদি। সমাজে এগুলোর বিশাল এবং চক্রাকার কুপ্রভাব আছে।

তাই আপনারা ক্রাশ খান, ঠিক আছে। খাওয়ার পরের কাজগুলো হতে হবে ইসলামের সীমার মাঝে। এটাই হুজুরদের বক্তব্যের ভাবসম্প্রসারণ।

২

অবৈধ মিলনের ফলে জন্ম নেয়া বাচ্চা বা ভ্রূণের করুণ পরিণতি নিয়ে কোনো নিউজ আসলে আমরা কাছে আসার গল্পকে তুলাধুনা করতে শুরু করি। ঠিক আছে, সমস্যা নেই। তবে সেকুলাঙ্গারদের একটি আর্গুমেন্ট কিন্তু আমরা দেখেও না দেখার ভান করছি। এটা প্রতিপক্ষের প্রতি সুবিচার হলো না।

সেকুলাঙ্গারদের মতে, 'বৈধ-অবৈধে'র এই আরোপিত ধারণাগুলো তুলে দেওয়া উচিত। দুজন মানুষ ভালোবেসে মিলিত হতেই পারে। সমাজ ছিঃছিঃ না করলে, ১০০ দোররা না মারলে সেই ভালোবাসার ফসলও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারতো। তাই তাদের মতে 'কাছে আসার গল্প' দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে সামাজিকভাবে নির্মিত 'বৈধ সম্পর্ক-অবৈধ সম্পর্কে'র ধারণাটা।

আচ্ছা, আর্গুমেন্টটা আমরা কয়েক দিক থেকে ভেঙে ভেঙে দেখার চেষ্টা করি। বিয়ে সম্পন্ন করার জন্য যেসব rituals প্রচলিত, তার বেশিরভাগই কিন্তু ইসলামিক শর্ত না। কাবিননামা থেকে শুরু করে হালদি নাইট, ম্যাহেন্দি নাইট, বৌভাত, জামাইপোলাও, ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতাগুলো হয় রাষ্ট্রযন্ত্রের চাপানো নিয়ম, নয়তো সমাজের। এই

অনুষঙ্গগুলো ফেলে দিলে বা শিথিল করে আনলে একটা অবৈধ সম্পর্ককে ইসলামিক্যালি বৈধ বানানো এমন কোনো ঝামেলা না।

আরেকটা ব্যাপার হলো তরুণ-তরুণী নিজে থেকে যদি কাউকে পছন্দ করে, মুরুব্বিদের উচিত না "দেশটা গেল রে গেল রে" বলে আঁতকে ওঠা। একটা মানুষ কত বছর যৌনক্ষুধা চেপে রাখবে? তবে বয়স্কদের গাইডলাইন ছাড়া বাচ্চারা হয়তো অপদার্থ কাউকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিতে পারে। সেটা রোধ করার জন্য শিশুকাল থেকেই ওইভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। সেটা না দিলে পরে হায় হায় করার কোনো অধিকার নেই।

আচ্ছা। অধিকারের কথা গেল। এবার দায়িত্ব। চিপায়চাপায় প্রেম না করে দুটো মানুষ যখন মহা ধুমধামের সাথে (রূপক অর্থে অবশ্যই), সমাজকে জানিয়ে, সাক্ষী রেখে বিয়ে করে, তখন অনেক দায়িত্ব চলে আসে। এই দায়িত্বগুলো সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। চিপায়চুপায় দায়িত্ব নেই, শুধু মজাটা আছে। এই দায়িত্বগুলো নেবার মতো সাহস যারা রাখে না, শুধু মজা নিতে চায়, 'বৈধ-অবৈধে'র ধারণা তুলে দিলেও তারা বাচ্চাকে ডাস্টবিনে বা ট্রাংকেই ফেলে রাখবে। এগুলো রোধ করতে তাই ছিঃছিঃ করা, দোররা মারা, পাথর মারার নিয়মগুলোর দরকার আছে।

এই বাচ্চাকাচ্চা পেলেপুষে জমিনে মানবজাতির খিলাফত জারি রাখাটা আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব। দায়িত্ব মানে তাতে কষ্ট থাকবেই। সালাত পড়তে কষ্ট আছে, সিয়াম পালন করতে কষ্ট আছে। আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় আমরা কষ্টগুলো করব, যাতে জান্নাতে গিয়ে আরাম করতে পারি। যারা আল্লাহর প্রতি সচেতন না, আল্লাহর ব্যাপারে জ্ঞান রাখে না, তারা শুধু শুধুই এ কষ্টগুলো করবে না। কিছু দেশে এমন হচ্ছেও যে মানুষ সন্তান না নিয়ে কুত্তা-বিলাই পুষছে। কারণ ঝামেলাও কম, কিছু একটা লালনপালনের স্বাদও পাওয়া গেল।

তাই 'বৈধ-অবৈধে'র ইসলামিক ধারণাটা থাকার দরকার আছে।

৩

ইনবক্সে অনেকেই একটি বিশেষ ধরনের সমস্যার সমাধান জানতে চান। বিপরীত লিঙ্গের মানুষ ঘটিত সমস্যা।

আলহামদুলিল্লাহ এমন জাহিল কমই আছে যারা "পবিত্র প্রেম" ভেবে হারাম সম্পর্কে লিপ্ত হয়। বেশিরভাগ হারামখোরই আসলে পবিত্র-অপবিত্রের ধার ধারে না। কিন্তু যারা আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা একটু একটু মেনে চলতে চায়, তাদের মনেও কি কিছু চেহারা মাঝেমাঝে দোলা দিয়ে যায় না? এই টান, এই আকর্ষণ, এই অস্থিরতা কি আল্লাহরই দেওয়া নয়? সমাজটাও এমন যে, সময়মতো বিয়েও করতে দেয় না। তাহলে উপায়!

কাউকে যেন বোঝানো যাচ্ছে না সমস্যাটা। বন্ধুদেরকে জানালেই তো তারা হৈহৈরৈরৈ করে উৎসাহ দেবে হারামে লিপ্ত হতে। আবার আশপাশের হুজুরগুলোকেও এ নিয়ে জিজ্ঞেস করতে কেমন ভয় ভয় লাগে। সবার কেমন ফেরেশতার মতো নূরানী চালচলন। কেমন গম্ভীর! এসব বালখিল্য জিনিস নিয়ে প্রশ্ন করলে যদি তারা ধমক দিয়ে বসে- "হপ! কীসব ফাহেশা চিন্তাভাবনা! যাও গিয়া তওবা কর। ৪০ রাকাত নফল নামাজ পড়!"

ভাইবোনেরা! প্রথমত, আপনি যে হারাম সম্পর্ক থেকে বাঁচার জন্য এতটা সচেষ্ট, এটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় রহমত। অনেকেই এই রহমত থেকে বঞ্চিত। কাজেই সবার আগে শুকরিয়া আদায় করুন।

দ্বিতীয়ত, যেই মানুষটাকে দেখে আপনার মাথা ঘুরে গেছে, যাকে মনের কথা বলার জন্য মনটা এত ছটফট করছে, যার কারণে রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে, তার ব্যাপারে আপনাকে কয়েকটা তথ্য দেই। তার পেটের ভেতর মলমূত্র থাকে। সে ঘুম

থেকে ওঠার পর তার মুখে দুর্গন্ধ হয়। সে গোসল না করলে তার শরীর ময়লা হয়। বেঁচে থাকলে সে একদিন বুড়িয়ে যাবে। চামড়া কুঁচকে যাবে। দাঁত পড়ে যাবে।
যেই সমস্যায় আপনি আছেন, সেই সমস্যায় ওই মানুষটাও কখনো ছিলো, অথবা এখনো আছে, অথবা ভবিষ্যতে থাকবে। কোনো মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ না। মনের এই অস্থিরতা, এই দিওয়ানাপান সবারই জীবনে আসে। আপনি যাকে দূর থেকে দেখে ভাবছেন একে না পেলে আপনি বাঁচতেই পারবেন না, সে নিজেও আসলে নানা সমস্যা-অস্থিরতায় জর্জরিত। আপনাকে দয়া করে বাঁচিয়ে তোলার কোনো সামর্থ্য তার নেই।

তৃতীয়ত, আমাদের সবার মাথায় এই জাহেলি সমাজ কতগুলো মন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছে "প্রেম জীবনে একবারই হয়। ড়িয়েল লাভ একবাড়ই জীবনে আসে।" ইত্যাদি। এসব মন্ত্র সব তরুণ-যুবার মাথায় ঘোরে। এই বয়সে এসে যখন কারো দিকে মন আকর্ষিত হয়, তখন ভাবে "একে পেতেই হবে", "একে ছাড়া আমার চলবেই না"। নিজেকে আর ওই মানুষটাকে সিনেমার নায়ক-নায়িকার আসনে বসিয়ে কল্পনার ডালপালা মেলতে শুরু করে। এটাতে ব্যর্থ হলে পরে "পিথিবিতে প্রেম বুলে কিচু নেই" টাইপের গান লিখতে বসে যায়।

আসল কথা হলো- আল্লাহ যে আমাদের ভেতর বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি সহজাত আকর্ষণ দিয়ে দিয়েছেন, তা যে কারো প্রতিই আসতে পারে। তালাক কিংবা বিধবা / বিপত্নীক হওয়ার পর আরেকটি বিয়ে করার বিধান ইসলামে রয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, জীবনে একজনেরই প্রেমে পড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই। একটা "প্রেম"-এ যদি ব্যর্থ হন বা একটা বিয়ে যদি ভেঙে যায়, তাহলে জীবন ধ্বংস হয়ে যায় না।

শেষ কথা, "প্রেম" করা, মনের মানুষটাকে কাছে পাওয়া এগুলো জীবনের মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদাত। হ্যাঁ, বিয়ে করা, সুসন্তান গড়ে তোলা এগুলোও ইবাদাতের অংশ। কিন্তু মনে রাখবেন, যেই আল্লাহ আপনার মাঝে জৈবিক চাহিদা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তাঁর হুকুম-আহকামের ব্যাপারে আপনি কমিটেড থাকলে সেই আল্লাহই আপনার জন্য সঠিক সময়ে একটি কল্যাণময় ব্যবস্থা করে দেবেন। **এইটুকু বিশ্বাসই যদি অন্তরে গেঁথে নিতে না পারলাম, তাহলে ঈমান আনার সার্থকতাটাই বা থাকলো কোথায়?**

কোথায় পাবো তারে

আমি জীবনে যখন প্রথম 'ক্রাশ খাই', তখনও বাগধারাটার মানে জানতাম না। জানার কথাও না, কারণ বাগধারাটার মতই খাদ্যদ্রব্য হিসেবে 'ক্রাশ' বেশ আধুনিক। আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে মানুষ 'ক্রাশ' খাওয়া তো দূরের কথা ক্রাশ খাওয়ার সুযোগও পেত না। আমরা ফিরিঙ্গিদের দেখাদেখি সিনেমা-নভেল-নাটকের বরাতে সভ্য-ভব্য হয়েছি, পাৎলুন পরে শিল্প-ঐতিহ্য চর্চায় নেমেছি। শেষমেশ ঘরের কোণে এক বাক্সে বাঈজীখানা, থিয়েটার আর সিনেমা হল বন্দী করে সভ্যতার সুঁইয়ের মাথায় আরাম করে বসেছি।

নব্বইয়ের দশকে আকাশ থেকে সংস্কৃতির বর্ষণ শুরু হবার পরে সেই সূচবৃষ্টি থেকে বাঁচে কার বাবার সাধ্য! তো রাস্তাঘাট থেকে বনেদি বৈঠকখানা, সকাল-সন্ধ্যা 'এক লাড়কি কো দেখা তো এয়সা লাগা' শুনে বড় হওয়া আমার জন্য যা অবধারিত ছিল, তাই হয়ে গেল। আমি ক্রাশ খেলাম।

ধর্ম মানি আর না মানি, ধর্মবোধটা আমার মধ্যে সবসময়ই টনটনে ছিল।
বিড়ালতপস্বীদের কিভাবে হাত করতে হয় সেটা শয়তান ভালই জানে।

অধিকাংশ ক্রাশের সূতিকাগার 'স্যার'-এর বাসায় যে মেয়েটা আমার মনে ধরল তার মাথাসহ সারা গায়ে জড়ান ছিল বিশাল এক কাল চাদর। সুন্দর চেহারার সাথে ধার্মিক চলন – আর কি লাগে?

পড়ার বইয়ের চেয়ে জানালা দিয়ে আকাশের মেঘ দেখতে বেশী ভাল লাগা শুরু করল। সে সামনে দিয়ে হেটে যায় আর আমি নড়তেই পারিনা। মা লক্ষণ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন – কাকে পছন্দ। বললাম। তিনি বললেন –

ক. তুই এখনও মেট্রিক পাশ। তোর কি এমন যোগ্যতা আছে যার কারণে মেয়েটা তোকে পছন্দ করবে? (মোটা চশমা আর গোল-গাপ্পু চেহারা নিয়ে আমি আশার কোন কারণ দেখলাম না)

খ. তোর পায়ে সমস্যা আছে। একটা মেয়ে চাইতেই পারে যে তার স্বামী খুঁড়িয়ে হাটবে না, আর দশজনের মত সুস্থ-নীরোগ হবে। (তিতা, কিন্তু সত্যি কথা। আমি লোহার পাত লাগান জুতা পরি, দৌড়াতে পারি না)

গ. যার মাধ্যমে তুই সত্যিকার যোগ্য হয়ে উঠতে পারবি সেটা হল লেখাপড়া। কিন্তু ইন্টারে প্রেমে পড়লে আর যাই হোক লেখাপড়া হয়না। (এ মর্মে মা বিবিধ পরিসংখ্যান এবং জীবন থেকে নেয়া উদাহরণ উপস্থাপন করলেন)

আমি ক্রাশ হজম করে ফেললাম, নিবিষ্টমনে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করলাম। পরে বহুবার ভেবে দেখেছি **মানুষ ক্রাশ খায় কেন বা প্রেমে পড়ে কেন।**

আল্লাহ সুরা রুমে এই প্রশ্নটার চমৎকার একটা জবাব দিয়েছেন – যেন সে 'সুকুন' লাভ করে। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন মানুষ অস্থিরতা, নিরাপত্তাহীনতা আর একাকিত্ব থেকে মুক্তি পাবে কিসে। তিনি দয়া করে আমাদের জন্য সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন যারা আমাদের 'সুকুন' দেবে।

সুকুন মানে শান্তিময় একটা পরিবেশে নিমজ্জিত থাকা, যেন পাহাড়ী হ্রদের স্বচ্ছ জলে স্তব্ধ এক পাথর।

সুকুন মানে জগতের ঝঞ্ঝাময় পরিবেশে হৃদয় জুড়ে থাকা প্রশান্তি, যেন ঝড়ো হাওয়ার তান্ডব আর মুষল বৃষ্টি থেকে পাথুরে প্রাসাদের দেয়া নিরাপত্তা।

পুরুষ ও নারী এভাবেই একে অপরকে ভালবাসায় নিমগ্ন করে রাখে, নিরাপত্তা দেয়, প্রশান্তি দেয়, পৃথিবী রূঢ়তা থেকে পালিয়ে বাঁচবার একটা অভয়াশ্রম দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে তাই নারী-পুরুষের সম্পর্ক তাই শুধুই দৈহিক চাহিদা কিংবা বংশরক্ষার মাধ্যম নয় – এর চেয়ে অনেক গভীর কিছু। এই গভীরতা জৈবিক ডারউইনিসম বা সামাজিক ডারউইনিসম এর চশমা পড়া বস্তুবাদী মানুষ মাপতে পারবে না।

আমাদের মানুষদের খুব বড় একটা সমস্যা হল – আমরা সব ভুলে যাই।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন বাসায় এসে 'বাড়ীর কাজের' কথা ভুলে যেতাম। এখন যখন ছাত্র পড়াই, তখন হামেশাই ভুলে যাই সে সময়টার কথা যখন আমাদেরও একটুও পড়তে ইচ্ছে করত না।

ঠিক তেমনি আমাদের বাবা-মা-বড় ভাইরা দিব্যি ভুলে যান ভাত পেট ভরায়, মন না। 'থার্মোডাইনামিক্স', 'ফার্মাকোলজি' কিংবা 'বিজনেস ল' – সবই মস্তিষ্কে দগদগে ঘা তৈরী করে, হৃদয়ের উপশম তো দূরের কথা। তারুণ্যের অস্থির বয়স পার হয়ে আসা আমাদের অভিভাবকরা কখন আমাদের জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে ভাবেন না – তাদের সন্তানেরাও রক্ত-মাংশে গড়া মানুষ। তাদেরও সুকুন চাইবার অধিকার আছে, সুকুন পাবার দরকার আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলো মনে পড়ে। কলাভবনে বসন্ত উৎসবের নাম করে ভবিষ্যৎ কপোতদম্পতি হাতে হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমরা ব্যাকটেরিয়ার কনজুগেশন পড়েই কাহিল। ক্লাস, পরীক্ষা, প্র্যাকটিকাল আর ল্যাবরিপোর্ট লেখার যন্ত্রণার মাঝের সময়টা বন্ধুদের সাথে কাটত। বিকেলে-সন্ধ্যায় টিউশনি। রাতে বিধস্ত অবস্থায় যখন বাসায় ঢুকি তখন মন নিয়ে ভাবনার সময় মিলত না খুব। অর্থহীন শতেক কাজে নিজেকে ব্যস্ত করে রাখা, পাছে বিশাল পৃথিবীতে একা হয়ে যাই!

হঠাৎ কখনও বুকের বিশাল শুন্যতা কৃষ্ণ গহবরের মত সব কিছু গ্রাস করে নিতে আসত। একটু সুকুনের জন্য কত পাপের দরজায় কড়া নাড়া! শান্তি তো মিলতই না উলটো নিজের সামনে নিজে ধরা পড়ে গেলে বিবেকের তীব্র দংশন।

চারপাশের সম্পর্কগুলো দেখে আর প্রেম করার ইচ্ছে জাগতো না। খালি আল্লাহর কাছে ভিক্ষে চাইতাম এমন একজন মানুষ সঙ্গীকে যে আমার সমস্যাগুলো বুঝবে। যে একান্তই আমার হবে; আর আমি যার কাছে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারব। যে আমার ভাল-মন্দ সব-সহই গ্রহণ করবে। যে আমার গুণগুলোর গোলাপ গাছে উৎসাহের পানি দেবে; দোষগুলোর আগাছা ভালবেসে দেখিয়ে দেবে, সেগুলো উপড়ে ফেলতে হাতে হাত রাখবে। এত বড় পৃথিবী – এত মানুষ; অথচ মনের মানুষের খোঁজ মিলল না। সব মিথ্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।

এমনই একটা সময়ে ইসলাম সম্পর্কে জানার, পড়াশোনার আগ্রহ বাড়তে থাকল। জানার সাথে সাথে আবিষ্কার করলাম এতদিন যেসব দিয়ে পরকালের আসল জীবনটাকে ভুলে ছিলাম সেগুলোর অন্তসারহীনতা। তখন হঠাৎ বুঝতে পারলাম **এই বিশাল পৃথিবীরই একটা ছোট কোণে আল্লাহ ঠিক এইভাবেই আরেকজনকে মানুষকে অপেক্ষা করাচ্ছেন**। আমাকে যেমন তিনি তৈরী করছেন তাকেও তিনি প্রস্তুত করছেন সেই বিশেষ ক্ষণটির জন্য। যে দিন তিনি আমাকে আমার 'লিবাস', আমার সারা জীবনের পরিচ্ছদের সাথে একত্রিত করবেন। যে মুহূর্তে দু'টো মানুষ কেবল আল্লাহকে ভালবেসে, তাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একসাথে জীবনের বাকি পথ পাড়ি দেবার সংকল্প করবে।

একজন মুসলিম তাই যখন আল্লাহর দরবারে হাত তুলে কেঁদে বলে, আল্লাহ এই পৃথিবীতে পবিত্র থাকতে চাই বলেই তোমার কাছে একজন পবিত্র জীবনসঙ্গী চাইছি – আল্লাহ সে হাত ঘুরিয়ে দেন না। **কিন্তু তার আগে তিনি পরীক্ষা নেন, আসলেই এই**

চাওয়াতে কতটা আকুলতা মিশে আছে। যে জিনিসটা খুব সহজে পাওয়া যায়, তার মূল্য মানুষ বোঝে না। যা অনেক চাওয়ার পর, অনেক ধৈর্য ধরার পর মেলে তার কদর থাকে বেশী। একজন মুসলিমের জন্য তার জীবনসঙ্গীর চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই এই পৃথিবীতে। তাই আল্লাহ প্রকৃত মুসলিমদের অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ে তবেই তাকে সেটা দেন। এই পরীক্ষা যারা দেয় না, তাদের প্রাপ্তিটার মূল্যও তারা বোঝে না।

আমাদের চারপাশে মিথ্যা ভালবাসার বন্যায় যারা ভেসে যায় তাদের সম্পর্কটা তাই খুব ঠুনকো হয়। সামান্য সন্দেহ, ছোট্ট ভুল বোঝাবুঝি কিংবা চাওয়া-পাওয়ার কষে আসা অংকের উত্তরে একটু গরমিল দেখলেই এ সম্পর্কের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়ে। যে সম্পর্ক সুকুন দেয়ার কথা ছিল, সেই সম্পর্ক নরকযন্ত্রনা নিয়ে হাজির হয়। কত মানুষ সেই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পৃথিবী ছেড়েই চলে যায়।

বিয়েকে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের অর্ধেক বলে সাব্যস্ত করেছেন[১] এবং কিসের ভিত্তিতে এই সম্পর্কটা হবে তাও তিনি বলে দিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের তথাকথিত মুসলিম সমাজ ইসলামের থোড়াই কেয়ার করে। যেখানে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিভাবকদের স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন যদি কোন মুসলিম যুবকের দ্বীন এবং ব্যবহার তোমাকে সন্তুষ্ট করে তাহলে তোমার অধীনস্থ নারীর সাথে তার বিয়ে দাও। এর অনথ্যা হলে পৃথিবীতে ফিতনা ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়বে বলেও তিনি ভয় দেখিয়েছেন। [২]

অথচ আমাদের দেশে ছেলে দেখা বলতে বোঝান হয় ছেলের অর্থসম্পদের পরিমাণ দেখা। চরিত্রও যে একটা সম্পদ এবং একজন মুসলিম তরুণ তার সচ্চরিত্র দিয়ে একটা মেয়েকে কতটা সুখী রাখতে পারে সেটা অভিভাবকেরা ভেবে দেখেন না। একটা লম্পট বিয়ের আগে পাঁচটা প্রেম করলেও লাখ টাকা বেতন পায় বিধায় ভাল পাত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। টাকার গুণে তার শত লুইচ্চামিও মোল্লা ছেলের দাড়ির চেয়ে অনেক বেশী সহনশীল মনে হয়। অথচ স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিন ওয়াদা করেছেন

কোন অভাবী যদি বিয়ে করে তবে তিনি আপন ঐশ্বর্যের দ্বার তার জন্য খুলে দেবেন, তাকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। [৩]

মাথায় টুপি পড়া, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়া বাবারাও যখন আল্লাহর আয়াতের চেয়ে ব্যাংকের স্টেটমেন্টকে বেশী বিশ্বাস করে, তখন দুঃখে বুক ভারী হয়ে আসে।

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কি মসজিদের তাকে ধূলার আস্তরণে বন্দী হয়ে থাকবার জন্য নাযিল হয়েছিল? অথচ আজ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন শুধুমাত্র বিবাহিত হবার কারণে প্রতিবছর মানুষের সম্পদ ৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। [৪]

কিন্তু দিনশেষে আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় বিয়ে একটা সামাজিক ইবাদাত। আমাদের বাবা-মার উপরেই আমাদের জোর চলে না, মেয়ের বাবা-মা তো দূরের কথা। তাই আমরা ফিরে যাই আমাদের শিক্ষক রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যিনি বিবাহযোগ্য অথচ অবিবাহিত তরুণদের শিক্ষা দিয়েছেন বিয়ে না করতে পারলে সিয়াম পালন করতে, কারণ এই সিয়াম তার জন্য ঢাল হয়ে পাপের রাশিকে প্রতিহত করবে। [৫]

আমি এমন মুসলিম ভাইকে চিনি যিনি বিয়ের আগে নিয়মিত একদিন অন্তর একদিন সিয়াম পালন করতেন। আলহামদুলিল্লাহ, এর ফলে আল্লাহ তাকে খুব চমৎকার একজন স্ত্রী উপহার দিয়েছেন। আমরা ফিরে যাই আমাদের প্রকৃত অভিভাবক, আমাদের রব্ব – আল্লাহর কাছে, তাকে কাতর কণ্ঠে বলি –

হে আমার রব্ব, তুমি আমার প্রতি যেই অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তারই মুখাপেক্ষী। [৬]

হয়ত আল্লাহ মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত স্ত্রী এবং রিযিক – দুইয়েরই ব্যবস্থা করে দেবেন। আমরা আত্মার শান্তির জন্য আল্লাহর কাছে আকুলভাবে বলি –

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ করুন [৭]

আল্লাহ যেন আমাদের মুসলিম তরুণ ভাই/বোনদের জন্য ইসলাম মেনে জীবন ধারণ করা সহজ করে দেন। তিনি যেন আমাদের 'লিবাস', আমাদের প্রাণসখা-দের সাথে আমাদের শীঘ্রই মিলিয়ে অস্থির একাকিত্ব থেকে মুক্তি দেন। আমিন।

———

[১] আল হাকিম তার আল মুসতাদরাকে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

[২] আল তিরমিযি তে আবু হুরাইরা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

[৩] সুরা আন নূর, ২৪:৩২

[৪] ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর হিউম্যান রিসোর্স রিসার্চ এর গবেষক জ্য জাগরস্কি এর গবেষণা সূত্রে

[৫] সহীহ বুখারি ১৯০৫, সহীহ মুসলিম ১৪০০

[৬] সূরা আল কাসাস, ২৮:২৪

[৭] সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৭৪

বিয়ে কি এমনই হওয়া উচিত?

আমরা এমন একটা সমাজে বসবাস করছি এখন, যেখানে প্রেম করার জন্য তেমন একটা ইচ্ছা/আগ্রহেরও দরকার পড়েনা, কিছু বুঝে উঠার আগেই তা একেকজনের উপরে আপতিত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমস্ত মেয়েরা এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। বন্ধুর মাধ্যমে, ফোনে, ফেসবুকের ইনবক্সে কেবলই প্রেমের জয়গান। শ্লোগান শোনা যায়, "যদি বন্ধু হও হাতটা বাড়াও", আর এই হাত বাড়ালেও হলো, তারপরেই পথ খুলে যায় আনন্দের — শহরের এখানে-ওখানে অজস্র আনন্দ-আবেগের ভাগাভাগি, খুঁনসুঁটি, হাসি-ঠাট্টা-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা যায় আরো অজস্র পথচারীদের সামনেই। আর এই অপার আনন্দকে পেতে কেবল একটা জিনিস লাগে — "ইচ্ছা"।

কিন্তু এই সমাজেই বিয়ে করার জন্য শত-সহস্র কঠিন ধাপ আছে। সেই ধাপের একেকটা পূরণ না করতে পারলে অপরাধী-আসামী হয়ে যেতে হয় নিকটাত্মীয়-পরিবারের কাছে, সর্বোপরি *সমাজ* নামের প্রতিষ্ঠানটির কাছে। হারাম সম্পর্ক গড়া যতটাই সহজ, হালাল সম্পর্ক করা ততটাই কঠিন।

আর হ্যাঁ, আমি অবশ্যই কেবল মুসলিম কমিউনিটি নিয়েই বলছি, যারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবী অন্তত করেন। আমার কলিগদের অনেকেই বিয়ে করলেন এই বছরেই। অনেক বড় ভাইরাও বিবাহিত হলেন। কয়েকটা ঘটনা বলি সাম্প্রতিক সময়ে দেখা...

প্রথম ঘটনাঃ এক কলিগের বিয়ে হলো। শান্তশিষ্ট, নিরহংকারী টাইপের ভালো ছেলে। বিয়েতে তিনি মোটামুটি তেমন কিছুই আয়োজন করেননি, গ্রামের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে। সেই নূন্যতম আনুষ্ঠানিকতাতেও তার কয়েক বছর ধরে তিলে তিলে জমানো টাকার অনেক বেশি — দুই লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছে। তার স্ত্রী পূর্বপরিচিত এবং তারাই নিজেরা নিজেদের সিলেক্ট করেছিলেন। তাই মুহর নিয়ে কথা উঠেনি খুব

বেশি। এই কলিগের বেতন তখন ছিলো বিশ হাজার টাকার মতন। তার বাবা অনেকদিন আগেই অবসর নিয়েছিলেন, সরকারি চাকুরে ছিলেন তাই তাদের মাসের আয় মাসেই শেষ হয়। বিয়ে হিসেবে এই খুব সাদামাটা বিয়েতে তার কত কষ্ট হয়েছে আমি জানি। প্রতিদিনই মুখ শুকিয়ে বলতেন, "ভাই, দুইটা বছর আমি দশটা টাকা হলেও জমিয়ে রেখেছি, তাও আব্বা-আম্মার কাছে চাইতে হলো। ছোট ভাই এখনো ইন্টার পাশ করে নাই। আমাকে এই টাকা দিয়ে দিতে হবে।" আমার মনে হচ্ছিলো, তার এখনই প্রতি মাসে সংসারে টান লাগে এই বেতনে চলতে গিয়ে। কীভাবে বাবা-মায়ের কষ্টার্জিত টাকা আরো কষ্ট করে ফেরত দিবেন জানিনা। তবে, বিয়েটা তাড়াতাড়ি সুন্দর করে করে ফেলার আগ্রহ দেখে তার প্রতি এখনো শ্রদ্ধা আসে আমার।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ আমার এক নিকটাত্মীয়ের, বয়স প্রায় ৩৪ বছর। দীর্ঘদিন যাবত তার চাকুরি হচ্ছিল না। এখানে ওখানে কোনরকম নিজেকে চালিয়ে নিতেন। জেলা শহরে বাড়ি আছে বলে ফ্যামিলিও তাকে চাপ দেয়নি, নিজেরাই চালিয়ে নিয়েছে খরচাপাতি। বছরখানেক আগে একটা সরকারী চাকুরি পেলেন তিনি, বিয়ের চেষ্টা শুরু হলো, বিয়ে হচ্ছেও। সপ্তাহখানেক আগে তিনি মেয়েবাড়ির জন্য বিয়ে উপলক্ষে শাড়ি এবং কসমেটিকস কিনলেন প্রায় ৭০ হাজার টাকার। কেনার পরে বলছিলেন, "ধার করে এত টাকা খরচ করতে হচ্ছে। আমার বউকে আমি বিয়ের পরে বলে দিবো স্রেফ এই টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত নতুন শাড়ি নাই"। উনি বিয়ের আনুমানিক খরচ আরো দেড় লাখ টাকা ভাবছিলেন। এই বিয়েটা গ্রামে না, জেলা শহরে। তার শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক থেকে তিন লক্ষ টানা দেনা দিয়ে সংসার জীবন শুরু করতে হচ্ছে, প্রতি মাসেই এই টাকার সুদ দিতে হবে। সেই দেনার চাপে পিষ্ট হয়ে সংসার জীবনে কী কী সমস্যা হবে, আল্লাহই ভালো জানেন।

তৃতীয় ঘটনাঃ পরিচিত এক ভাই মোটামুটি একটা অনুষ্ঠান করলেন ঢাকা শহরে — সবাইকে হাসিমুখ দেখিয়ে, অভিজাত কমিউনিটি সেন্টারে জমজমাট আপ্যায়নে বিয়ে

হলো। আনুসঙ্গিক দুই বাড়ির হলুদ, বৌভাত হয়েছিলো ফুটবল লীগের প্লে-অফ ম্যাচের মতন। সাথে ছিলো DSLR ক্যামেরায় শত শত ছবি, জামাই-বউয়ের পেছনে দলবেঁধে দাঁড়ানো গ্রুপ ছবিগুলোতে ফেসবুকে সবাই গুষ্টিধরে ট্যাগ করা হলো। এই আয়োজন দেখে তার ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করতে বললো, বললো মাত্র দশ লক্ষ টাকার একটু বেশি খরচ হয়েছে। সেই ভাইয়ের বেতন সম্ভবত হাজার চল্লিশেক টাকা। বাবার ঢাকায় ফ্ল্যাট আছে। আর কিছু জানিনা।

প্রেমের বিয়ের কথা আলোচনায় না আসুক, কারণ ইসলামে তার স্থান নেই। কিন্তু আমাদের সমাজে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ বলে যেই জিনিসটা চালু আছে, তাতে মা-খালা-ফুফুসহ অন্য অভিভাবকমহলের প্রভাব আর আগ্রহ দেখলে মনে হয়না বিয়েটা একজন তরুণ আর এক তরুণীর। বরং দেখা যায় তাতে অন্য সবার অংশগ্রহণ, খায়েশ অনেক বেশি। আয় এবং খরচের এই অদ্ভূত অনুপাতটার হিসেব কে দিতে পারবে? তাছাড়া, ইসলামের একটা সংস্কৃতি আছে যা আল্লাহর নির্দেশনা থেকে উৎসারিত। কিন্তু এসব বিয়ের খরচের সঠিক সার্বজনীন কারণটাই কে দেখাতে পারবে?

ক'দিন আগে একটা কথা পড়লাম, বেশ যৌক্তিক লেগেছিলো আমার কাছে — "এখনকার মেয়েরা বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে ঘোরাক্রান্ত হয়ে স্বপ্ন দেখে বছরের পর বছর, তাই বিবাহিত জীবন নিয়ে ভাবার সময় পায়না। সিরিয়াল, ম্যাগাজিন, অ্যাডভার্টাইজ দেখে মাথায় তাদের wedding নিয়ে এত বেশি চিন্তা ঘুরে marriage লাইফ নিয়ে, আজীবনের সঙ্গীটাকে নিয়ে ভাবার সময় পায়না তারা"।

ইমাম সুহাইব ওয়েব একদিন এক আলোচনায় বলেছিলেনঃ "বিয়ে ইসলামে সবচেয়ে সহজ এবং আমাদের সংস্কৃতিতে সবচেয়ে কঠিন একটি বিষয়"।

একটা ছেলে যদি বিয়ে করতেও চায়, তার প্রতিবন্ধকতা আসে — "তুমি তো এখনো তেমন আয় করো না"। অথচ এই আয় না করা ছেলেটা জীবনের একটা কঠিন সময়

অতিক্রম করে, যদিও কোনভাবে ভয়াবহ কঠিন মুহূর্তগুলো পাশ কাটিয়ে একটা চাকুরি করে বিয়ে করতে যায়, তার সামনে কমপক্ষে একবছরের বেতনের সমান খরচের বিয়ের আয়োজনের বার্তা আসে। আমাদের এই দেশ এখন অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু, তবু এই সমাজের মানুষগুলো বিশাল ঢাক-ঢোল আয়োজন ছাড়া বিয়ে না করলে তাকে গ্রহণ করেনা।

আরো আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, ইসলামিক [মুসলিম বলছিনা কিন্তু] অথবা নন-ইসলামিক – যেকোন পরিবারগুলোই পৃথিবীর আর কিছু যা-ই থাক, বিয়েতে বিশাল আয়োজনের, টাকা খরচ করার, সমাজের কাছে মাথা উঁচু করে(!) তাদের খুশি করার চেষ্টাতে কিছুতেই কমতি করেনা। মানুষের ইসলামের অনুভূতি মূলত আর্থিক অবস্থানের সাথে সাথে নিজস্ব ব্যাখ্যা পায়। যার হয়ত একটা বাড়ি থাকে, গাড়ি থাকে, হাতে কিছু মোটা অংকের ক্যাশ থাকে, তখন তার কাছে বিয়ের আদিখ্যেতা খরচ করতে না পারাটা *ছোট মনের* বলে প্রতীয়মান হয়।

আমাদের দেশের বিয়েগুলোতে মেয়েপক্ষ সজ্ঞানে-অজ্ঞানে ছেলেপক্ষের কাছে *দায়গ্রস্ত* থাকেন, খুব প্রচলিত একটা ঘটনা হলো ফার্নিচার দেয়া। মেয়ের বাবা যেমন অর্থ-সম্পদের মালিকই হোন না কেন, তিনি ধার-দেনা করে মেয়ের বিয়েতে খরচ করতে মরিয়া হয়ে যান। মেয়ের সুখের জন্য তাকে যে করেই হোক জামাইকে কিছু দিতে হবে। এখানেও যন্ত্রণা, কষ্ট, ধার-দেনা। কতরকম খোঁটা খাওয়ার ভয়! বিয়ের আয়োজনেই অস্থির অবস্থা। ওইদিকে আছে বৌভাত, হলুদ, আরো কত কী!!
আল্লাহ তো কুরআনুল কারীমে জানিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকেঃ

[১] “কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ”। [আল ইসরাঃ ২৬-২৭]

[২] “খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না”। [আল আরাফঃ ৩১]

আরো কতরকম আদিখ্যেতা বিয়ের অনুষ্ঠানে! যেগুলোর কোনটাই সুন্নাহ নয়, বরং স্কলারদের মতে অনেকগুলোই নিষিদ্ধ। আঞ্চলিক কিছু প্র্যাকটিস তো বলার মতই না, এতই জঘন্য। আমার এক বোনের বিয়েতে সেই বাড়ির নিয়মানুযায়ী দুধে পা ডুবানো, আয়নায় মুখ দেখা, অনেকগুলো মিষ্টি খাওয়া — এরকম আরো অনেকগুলো অসভ্য ঢং করার পর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষটাকে ঘুমাতে দেয়া হয় কয়েক ঘন্টা পর, মাঝরাতে পেরিয়ে গেলে। এইসব ছাড়াও সার্বজনীন আর বাহুল্য কালচার যেসব আছেঃ

- আংটি পড়ানো
- দামী কার্ড ছাপানো
- শুধু শুধু বা আভিজাত্য জাহিরের জন্য দামী কমিউনিটি সেন্টার/হোটেল ভাড়া করা
- শুধু মাত্র বিয়ের দিনের জন্য দামী পোশাক কেনা যা আর কখনও পড়া হয় না
- গায়ে হলুদ
- কনের/বরের সাজসজ্জায় অপ্রয়োজনীয় খরচ।
- অনুষ্ঠানে নারী পুরুষ একসাথে অবাধে মেলামেশার সুযোগ, নাচ-গানের আয়োজন
- গেটে টাকার জন্য বর-কনেদের বিব্রত করা, বাদানুবাদ
- বিয়ের দিনে সাজুগুজু আর অতিথি আপ্যায়ন করতে গিয়ে নামায না পড়া

অথচ আল্লাহর দ্বীন হলো একদম সহজ। বিয়েতে কথা তোলার জন্য দরকার হয় একজন ওয়ালী, যিনি হবেন মেয়ের বাবা/অভিভাবক। তিনি মেয়ের মত নিয়ে কথা বলবেন ছেলের সাথে। মুহর ঠিক হবে যার সুন্নাহ হচ্ছে পুরোটাই কনেকে পরিশোধ করে দিবে বর বিয়ের আগেই, তবে যদিবা না পারে, তবে পরে দিতে পারবে যদি কনে

তাতে অনুমুতি দেয়। এই মুহর থেকে কোন অংশ সাংসারিক কাজে ব্যয় করতে বলতে পারবে না ছেলে। এই টাকা একান্তই মেয়েটার।

আমাদের দ্বীনে মেয়ের/মেয়েপক্ষের বলতে গেলে কোনই খরচ নেই একটা বিয়েতে। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত যত বোঝা, তার সমস্ত কিছুই আমরা নিয়ে এসেছি অন্য ধর্মের সংস্কৃতি থেকে। একইভাবে একটা বিয়েতে যত কম খরচ হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সেই বিয়ে বেশি পছন্দের। আমরা কি আল্লাহর পছন্দের বান্দা হতে চাই, নাকি সমাজের দাস?

আমাদের আদর্শ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

[৩] "সবচাইতে নিকৃষ্ট খাদ্য হচ্ছে সেই ওয়ালিমাহ এর খাদ্য যেখানে কেবল ধনীরাই নিমন্ত্রন পায়, গরীবেরা নয়"। [সহীহ বুখারী]

[৪] "সবচাইতে উত্তম বিয়ে হচ্ছে সহজতম বিয়ে (মোহরানার দিক থেকে)"। [ইবন মাজাহ, আবু দাউদ]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ হচ্ছে দ্বীনদারীর যোগ্যতা দেখে জীবনসঙ্গী বাছাই করে বিয়ে করা। জীবনের সাথী হতে হবে এমন একজন মানুষ যিনি আল্লাহকে ভয় করেন। কোনকিছুতে আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ পাওয়ামাত্র যিনি মেনে নিবেন, শুধরে নিবেন নিজেকে। সংসার জীবনে কীভাবে আর দ্বিমত হবে, মনোমালিন্য হবে যখন কুরআন আর সুন্নাহ মানতে আগ্রহী দু'জনেই? বরং তারা আজীবন আল্লাহকে ভালোবেসেই নিজেদের আঁকড়ে ধরে থাকবে এই দুনিয়া ছাপিয়ে অনন্ত জীবনের সঙ্গী হবার স্বপ্নে।

আল্লাহর নির্দেশ তো অনুপম, তার পালনকারীও হবেন সেরা মানুষ! হতে পারি আমরা জীবনে অনেক ভুল করেছি, এখন চাইলেই নিজেদের শুধরে নিতে পারি। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশকে এড়িয়ে যেতে চাইলে, নিজেদের মতন চলতে চাইলে সেটা কি আল্লাহর দাসত্ব করা হয়? নাকি নিজের নফসের?

আল্লাহ যে রাহমানুর রাহিম, সেইটার অনুধাবন করতে অনেক জ্ঞানী হতে হয়না। এই কঠিন আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার সময়ে চারপাশে তাকালেই বোঝা যায়। আল্লাহ তার অনন্ত ভালোবাসা আর রাহমাতের হাত তিনি প্রশস্ত করে দেন সবাইকেই। সবাই নিজ নিজ ব্যাখ্যা দিয়ে জীবন পরিচালিত কতে পারে, নিজেকে নিয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে পারে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আখিরাতে আল্লাহর বিচার যে অনেক সূক্ষ্ম হবে। কেউ ছাড় পাবেনা একটুও। কিছুতেই না। আর সেই ছাড় না পাওয়াটা যে আসলেই সবচাইতে সুন্দরতম জিনিস — সেই উপলব্ধিটা প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় মোহাচ্ছন্ন অমানুষদের আচরণ, কাজ দেখলে অনুভব করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে তাঁর নির্দেশনা মেনে দুনিয়াতে চলার তাওফিক দান করুন, অতীতের ভুলগুলোর তাওবা করে তার পথে ফিরে আসার তাওফিক দিন, আখিরাতের অনন্ত জীবনে মুক্তি পাওয়ার যোগ্য করে দিন। আমিন।

বিয়ে

নব্বইয়ের দশকে বিটিভিতে ‘ওশিন’ নামে একটি জনপ্রিয় জাপানী সিরিয়াল প্রচারিত হয়। আমরা তখন সম্ভবত অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি। বান্ধবীরা প্রায়ই এর বিভিন্ন এপিসোড নিয়ে কথা বলতাম। একবার দেখানো হোল ওশিন এমন এক নির্জন জায়গায় গিয়ে চাষবাস করতে শুরু করল যেখানে স্কুলশিক্ষক ছাড়া আর কোন উপযুক্ত পুরুষ নেই মেয়ে বিয়ে দেয়ার জন্য। সে আর কোন উপায় না দেখে মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে স্কুলশিক্ষকের কাছে বিয়ে দিয়ে দিল। একটা সন্তান হওয়ার পর মেয়েটির এমন একজনের সাথে পরিচয় হয় যাকে তার মন থেকে পছন্দ হয়। বেশ কিছুদিন চিন্তাভাবনা করার পর সে সিদ্ধান্ত নেয় যে শিক্ষক স্বামীকে ছেড়ে সে ঐ লোকের সাথে সংসার করবে। ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের মধ্যে এমনভাবে তোলপাড় সৃষ্টি হোল যেন আমাদের পরিচিত কেউ এমনটা করে বসেছে!

আমার কোন বোন নেই। ভাইদের সাথে বড় হওয়াতেই কি’না জানিনা, আমার রান্নাবাড়া, সাজগোজ, প্রেম বিবাহ বিষয়ে খুব একটা আগ্রহ ছিলনা কখনো। বাস্তব জীবনের চেয়ে বইপত্রের সাথে সম্পর্ক ছিল বেশী। তাই বিবাহ বিষয়ে ধারণা ছিল সিন্ডারেলা মার্কা গল্পে যা লেখা থাকে তেমন, কোনপ্রকারে একবার বিয়ে হয়ে গেলেই “happily ever after”. আমাদের অধিকাংশ মেয়েদের মধ্যেই এই ধরণের ভুল ধারণা কাজ করে। কারণ রূপকথার বইগুলো আমাদের কোনভাবেই জীবনের বাস্তবতার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করেনা। তাই বান্ধবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মুষড়ে পড়েছিলাম আমি। এমনটা তো হওয়ার কথা না!

তখন আমার ফিলসফার বান্ধবী শিমু আমাকে খুব ভালো একটা ব্যাখ্যা দিল। সে বল্ল, “ইসলামে বিয়ের বিধানের ওপর এত গুরুত্ব দেয়ার একটা অন্যতম কারণ হোল চরিত্র সংরক্ষণ এবং সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখা। আমাদের সমাজে আমরা ইসলামের

বিধানের চেয়েও আঞ্চলিকভাবে যা চলে এসেছে তাকে বেশী গুরুত্ব দেই, মানুষ কি বলবে তা ভেবে বেশী চিন্তিত হই। তাই দেখা যায় লোকে কি বলবে ভেবে অনেকে বছরের পর বছর এমন একজনের সাথে আপাতদৃষ্টিতে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখে যেখানে একজনের সাথে আরেকজনের আদৌ কোন সম্পর্ক থাকেনা। দু'জন মানুষ একই বাড়ীতে থাকে, একসাথে খায়, ঘোরে কিন্তু একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারেনা। কেউ কেউ সন্তানদের কথা ভেবে নিজেকে বঞ্চিত করে, চালিয়ে যায় সুখে থাকার নাটক। যারা অতটা দৃঢ় মানসিকতাসম্পন্ন নয়, তারা ডুবে যায় ব্যাভিচার বা অনৈতিক কার্যকলাপের আবর্তে। সেক্ষেত্রে তো বিয়ের মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হচ্ছে! তার চেয়ে কি এটা ভালো নয় যে তারা যেভাবে নিজেদের চরিত্র সংরক্ষণ করতে পারবে সেভাবেই সিদ্ধান্ত নেবে? তার মানে এই নয় যে তারা যে বৈবাহিক সম্পর্ক আছে তাকে সহজভাবে নেবে। এর মানে হোল তারা সর্বোত চেষ্টা করে দেখবে এই সম্পর্ক কার্যকর করা যার কি'না আর তারপর ব্যার্থ হলেই কেবল আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে।

"এটা অবশ্যই খুব দুঃখজনক অবস্থা যদি কোন ব্যাক্তি সঠিক মানুষটিকে খুঁজে পান তাঁর বিয়ের পর। এজন্যই হয়ত পর্দার ওপর এতখানি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, এই দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য। কিন্তু একইসাথে বিবাহিত ব্যাক্তির জন্য ব্যাভিচারের শাস্তি নির্ধারন করা হয়েছে মৃত্যুদন্ড যেখানে অবিবাহিত ব্যাক্তির জন্য শাস্তি অপেক্ষাকৃত কম। যেহেতু অবিবাহিত নারীপুরুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সংযমের অভাবের কারণে ঘটতে পারে। কিন্তু বিবাহিত নারীপুরুষদের ক্ষেত্রে সীমালংঘনই মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পুরুষদের জন্য একাধিক বিয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে যদিও আল্লাহ বলেছেন এক বিয়েই তাঁর কাছে অধিক পছন্দনীয় এবং একাধিক বিয়ের শর্ত এত কঠিন করে দেয়া হয়েছে যে চিন্তাশীল ব্যাক্তি মাত্রেই ভয় পাবে। কিন্তু এর পেছনে উদ্দেশ্য এই যে, যদি এই দুর্ঘটনা ঘটেই যায়, তাহলে ব্যাভিচারের পরিবর্তে সঠিক পথটিই যেন মানুষ বেছে নেয়।

“সুতরাং, আমাদের সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ আমাদের এমন সঙ্গী মিলিয়ে দেন যার সাথে আমাদের সম্পর্ক হবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য- ঐ সাত ব্যাক্তির একজনের মত যারা কেয়ামতের দিন আরশের নীচে ছায়া পাবে যখন বারোটি সূর্য ঠিক মাথার ওপর অবস্থান করবে। আল্লাহ যেন আমাদের জন্য বৈবাহিক জীবন এবং দায়িত্ব সহজ এবং আনন্দময় করে দেন যাতে ইসলামের ওপর অবস্থান করা এবং চরিত্র সংরক্ষণ করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়”।

শিমুর কথায় আমার যে শুধু এই ব্যাপারে ধারণা স্পষ্ট হোল তাই নয়, আমি বুঝতে পারলাম যে আমরা অনেক ফালতু ব্যাপারে দোয়া করতে করতে অস্থির হয়ে যাই, অথচ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোতে আল্লাহর সাহায্য চাইতে ভুলে যাই। মজার ব্যাপার হোল, আমি যখন আমার ছাত্রীদের বলতাম সঠিক বিয়ের জন্য দোয়া করতে, তারা খুব লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলত, “এটা কি বললেন ম্যাডাম? এ’রকম লজ্জাজনক বিষয়ে কি আল্লাহকে বলা যায়?” অথচ ভুরি ভুরি ছেলেমেয়ে দেখেছি যারা বাবামাকে লুকিয়ে প্রেম করে আর সেই প্রেমে সাফল্য আসার জন্য আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে মহাবিশ্ব ফেঁড়ে ফেলার জোগাড়!

তাদের একজনকে বলেছিলাম, “তুমি আল্লাহকে বল যেটা তোমার জন্য ভালো হবে, আল্লাহ যেন সেটাই তোমাকে দেন। তুমি নিজে নির্দিষ্ট করে দিয়োনা তুমি কি চাও। কারণ আমরা কেউ জানিনা আমরা যা চাই তাতে ভালো আছে না মন্দ”। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। শেষমেশ বহুবছর পর, বহু নিশীথ রজনী অশ্রুব্যাকুল হয়ে দোয়া করার পর আচমকা কিভাবে যেন সব বাঁধা পরিষ্কার হয়ে গেল। তার বিয়ে হয়ে গেল নিজের পছন্দমত। সে এখনো প্রতিরাতে ব্যাকুল হয়ে কাঁদে, “আমি নাহয় ভুল করে তাই চেয়েছি যা আমার জন্য ভালো নয়, কিন্তু তুমি কেন আমায় তা দিলে আল্লাহ?” আপনারাই বলুন, আল্লাহ এখন কি করবেন?!

আরেকবার এক ভাইয়ের বৌ মারা গেলেন হঠাৎ করে। বাচ্চাদের নিয়ে বেচারা হিমশিম খাচ্ছেন। ভাইয়ের বয়স খুব বেশী না। আমরা বললাম, কত বিধবা মেয়ে আছে যাদের কোন অভিভাবক নেই, তাদের একজনকে যদি উনি বিয়ে করেন তাহলে দু'জনেরই উপকার হতে পারে। স্বামী বা স্ত্রী মারা গেলে অন্যজনের সব প্রয়োজন বা চাহিদা তো আর অদৃশ্য হয়ে যায়না! সংসার চালাতে হবে, সন্তানদের দেখাশোনা করতে হবে, কোনটা বাদ দেয়ার মত? একজনের জীবনাবসান হয়েছে বলে তো আরেকজন জীবিত মানুষের জীবনের ইতি টেনে দেয়া যায়না। এর মানে এই নয় যে তাদের সম্পর্কে কোন ঘাটতি ছিল। বরং কেউ যদি কারো ব্যাপারে সত্যিই ভাবে তাহলে সে চাইবে সে মারা গেলে যেন তার সঙ্গী জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হয়ে সুখী হয়। কিন্তু আত্মীয় স্বজনরা অনেকসময় ইসলামের তোয়াক্কা না করে চলতি প্রথা অনুসারে চিন্তা করেন। বিধবা বা মৃতদার বিয়ে করবেন এটা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। আমার এক বন্ধু ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, "তারা (আত্মীয়স্বজনরা) বরং এ'টাই ভালো মনে করে যে যাদের স্বামী বা স্ত্রী মারা গেছেন তারা অবৈধ কিছু করুক, ওটা হয়ত লোকে দেখতে পাবেনা। কিন্তু বৈধ উপায়ে বিয়ে করলে যে লোকে ছি ছি করবে সেটা তারা কিছুতেই সহ্য করতে রাজী না"।

আমাদের সমাজে হয়ত অভাব, হয়ত লোভ থেকে এখন আরেকটা প্রথা প্রচলিত হয়েছে। বিয়ে করে বৌ রেখে বছরের পর বছর বিদেশ থাকা। কেউ টাকার জন্য, কেউ সিটিজেনশিপের জন্য, কেউ একটা স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য, কেউ পরিবারের প্রয়োজনে। আবার অনেকে বাড়ীতে বৌ রেখে শহরে পড়ে থাকেন মাসের পর মাস। অথচ আল্লাহ বলেছেন স্বামী স্ত্রী একজন আরেকজনের পরিচ্ছদস্বরূপ। পোশাক যেভাবে আমাদের শীতগ্রীষ্ম, রোদবৃষ্টি, পোকামাকড় থেকে রক্ষা করে; আমাদের সৌন্দর্য বর্ধিত করে, অসৌন্দর্য ঢেকে রাখে- স্বামী স্ত্রী সেভাবেই একজন আরেকজনকে সাহায্য সহযোগিতা, আলাপ পরামর্শ, সাহস বা সান্তনা দিয়ে পরস্পরকে পরিপূরণ করবে। কিন্তু দু'জন যদি বছরের পর বছর পরস্পরকে না'ই দেখে, শুধু ফোনে কথা বলে আর

আকাশপাতাল কল্পনা করে কি চরিত্র সংরক্ষণ করা যায়? এর ফলশ্রুতিতে আমাদের সমাজে পরকীয়াসহ নানাধরণের বিশৃংখলা দেখা যাচ্ছে। মানুষ তাদের প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যার্থ হচ্ছে, আবার এই অবৈধ কার্যকলাপ ঢাকতে গিয়ে আরো বড় পাপের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে। বিদেশেও যে ভাইরা সবসময় নিরাপদ থাকেন, ব্যাপারটা তেমনও নয়। বিদেশের মাটিতে মানুষের মন প্রায়ই খারাপ থাকে, তখন প্রলোভন থেকে নিজেকে বিরত রাখা স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকেই পা পিছলে পড়ে যান পংকিলতার পিচ্ছিল পথে। উমার (রা) মুসলিম সৈনিকদের জন্য প্রতি চারমাসে বাড়ী ফিরে আসা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন এই ধরণের সামাজিক বিপর্যয় রোধ করার জন্য। আমাদের ভাইদের ক'জন প্রতি চারমাস অন্তর স্ত্রীর সাথে সময় কাটাতে আসেন বা আসতে পারেন? পরিবারের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অনেকেই নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা সাধ আহ্লাদ কোরবানী করে দেন বছরের পর বছর। কিন্তু তাদের আত্মীয়স্বজন মনে করেন, বিদেশে তো টাকা আকাশে বাতাসে ওড়ে, তার কাছে নিশ্চয়ই আরো টাকা আছে কিন্তু সে আমাদের দিচ্ছেনা। এই পরিস্থিতিতে দেশে ফিরে আসা কঠিন বৈকি! আর দেশে যারা দূরে থেকে কাজ করেন তাদের স্ত্রীদের অনেক সময় বাবামা আসতে দেন না, হয়ত এই মনে করে যে তাহলে ছেলে আর বাড়ীতে টাকা পাঠাবে না! তাই দেশে থেকেও তারা চরিত্র সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত!

পারিবারিক বা সামাজিক প্রয়োজনে আজকাল আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক মহিলা সংসারের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রেও কাজ করছেন। কিন্তু আমাদের সামাজিক কাঠামো এখনো তাদের এই উভয় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার উপযোগী হয়ে ওঠেনি। কাজের লোকের সাহায্য ছাড়া সংসার চালানোর মত গৃহ, রান্নাঘর, গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি, পানির ব্যাবস্থা, পারিবারিক কাঠামো, বাচ্চাদের জন্য সুব্যাবস্থা এখনো সুদূরপরাহত। অনেক মহিলারাই কাজ করেন পুরুষপরিবেষ্টিত পরিমন্ডলে যেখানে নারী বলেই তাদের প্রতি সৎমাসুলভ আচরণ করা হয়। অনেকেই সারাদিন এ'ধরণের কষ্টকর

পরিস্থিতি থেকে একটু শান্তির আশায় ঘরে ফেরেন। কিন্তু অধিকাংশ মহিলা যৌথ পরিবারে থাকেন বিধায় ঘরে ফিরেও পারিবারিক দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি মিলেনা। শ্বাশুড়ীকেন্দ্রিক পরিবারে শ্বাশুড়ী বিবেকবতী না হলে মহিলাদের ২৪ ঘন্টাই কাটে এক দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে। তদুপরি স্বামীও যদি তাদের সময় বা সাহচর্য না দেন, যেটা যৌথ পরিবারে অনেক সময়ই সম্ভব হয়ে ওঠেনা, তখন তাদের দিক হারানোর সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। এটা শুধু নারীদের ক্ষেত্রেই নয়, যে পুরুষ সারাদিন চাকরী করে বাড়ী ফিরে দেখেন বৌ শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবায় নিয়োজিত সম্পূর্ণ সময়, তাঁর সাথে দু'দন্ড বসে কথা বলার সময় নেই স্ত্রীর, তিনিও একই ভাবে পথ হারাতে পারেন।

একবার ইউনিভার্সিটিতে এক ক্লাসে ছাত্রী কথাপ্রসঙ্গে বলছিল, "ম্যাডাম, আমি ইউনিভার্সিটি আসি বলে সবদিন সকালে বাসার সবার জন্য নাস্তা বানাতে পারিনা। তাই শ্বাশুড়ী আমাকে নাস্তা খেতে দেননা। আমি এখন পাঁচমাসের প্রেগ্ন্যান্ট। প্রতিদিন খালিপেটে ক্লাসে এসে বমি করি। বাসায় গিয়ে রান্না করতে পারলে খাবার জোটে নতুবা নয়। আমার শ্বাশুড়ীর যদি ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান থাকত তাহলে কি উনি এ'রকম করতে পারতেন?" সে প্রথমে যে বর্ণনা দিল তাতে আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরতে শুরু করল- যে মহিলা তার হবু নাতি বা নাতনীর মায়ের সাথে এমন আচরণ করছেন, তিনি কি ভাবছেন তিনি এই মেয়েটাকে প্রতিদিন কি বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন? নূন্যতম মানবতাবঞ্চিত এই মেয়েটা যদি কারো কাছ থেকে ন্যূনতম মানবিক ব্যাবহার পায়, তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে বা তার সাথে পালায়, তাকে কি খুব দোষ দেয়া যাবে? কি নিশ্চয়তা আছে যে এ'রকম মানসিক তোলপাড়ের মধ্যে সে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে? তার স্বামী কি ধরেই নিয়েছেন যে একটুকরা কাগজে দু'জনে সই করেছে বলে তিনি এবং তাঁর পরিবারের সকলে এই মেয়েটাই সাথে এমন অমানবিক আচরণ করতে পারেবন অথচ সে তাদের প্রতি অনুরক্ত থাকতে বাধ্য?!

এক বন্ধুকে একবার বলেছিলাম, “ভাই আপনি এত ভালো মানুষ, এত গুরুত্বপূর্ণ একটা পজিশনে চাকরী করেন, অথচ একটা মেয়েকে নিয়ে আপনাকে ঘুরতে দেখেছে অনেকেই। আপনি তাকে বিয়ে করুন বা বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কিন্তু আপনি যা করছেন তা আপনিও জানেন অন্যায়, কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা আপনার মত একজন অসাধারন মানুষ যখন এই কাজটা করছেন তখন অন্যদের আমরা আর কিছু বলতে পারছিনা যাদের বলা প্রয়োজন”। উনি কিছুক্ষণ কিভাবে বুঝিয়ে বলবেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, “আমাদের বাড়ীতে সব ভাইবোন পালিয়ে বিয়ে করেছে কারণ আমাদের বাবামা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তারা নানাধরনের বাহানা দিয়ে আমাদের সময়মত বিয়ের ব্যাবস্থা করেন না। আমি একটু আধটু ইসলাম বিষয়ে পড়াশোনা করেছি। তাতে লাভ হয়েছে এই যে আমি পালাইনি, বাবামা’র সব আকাঙ্ক্ষা পূরন করেছি, বাড়ী বানিয়ে দিয়েছি, বোনদের বিয়ে দিয়েছি, টাকাপয়সা দিচ্ছি প্রতিমাসে- কিন্তু তারা আমাকে বিয়ে করতে দিতে রাজী নন। যদি বিয়ের পর এভাবে ওদের জন্য খরচ করতে না পারি! আমার চল্লিশ হতে খুব একটা দেরী নেই। আর চল্লিশের পর আমার আর বিয়ে করার প্রয়োজনই নেই। কিন্তু বাবামাকে কে বোঝাবে? আমি এখন আমার ‘ভুলের’ মাসুল দিচ্ছি। দুনিয়াতেও গুনাহ কামাচ্ছি, আখেরাতেও এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

“এ’ তো গেল বাবামা’র কথা। যে মেয়ের আমাকে পছন্দ তাকে বললাম, চল আমরা ছোটখাট করে বিয়ে করে ফেলি। সে তখন বেঁকে বসল। কমপক্ষে দশভরি গহনা আর বড় অনুষ্ঠান না করলে সে বিয়েই করবেনা। আপনি তো গোল্ডের দাম জানেন নিশ্চয়ই। বলেন তো আরো কত বছর চাকরী করলে আমার দশ ভরি গোল্ড কেনার সামর্থ্য হবে?” ওনাকে বিচার করা আমার উদ্দেশ্য ছিলনা। তাই চুপ করে রইলাম।

ছোটবেলায় এক ভদ্রমহিলার কথা শুনেছিলাম যিনি বোনকে তালাক দিইয়ে বোনের স্বামীকে বিয়ে করেছিলেন। বাংলাদেশে ফেরার পর এক পরিবারের সাথে সখ্যতা গড়ে

ওঠে। পরে জানতে পারলাম এই সেই পরিবার যার কথা আবুধাবীতে বসে শুনেছিলাম। একদিন ওনার বাবার সাথে কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম বড় বোন স্বামীকে দিয়ে ছোটবোনের আনানেয়া থেকে শুরু করে সব কাজ করাতেন। অথচ হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে এই সম্পর্কগুলো থেকে ততটাই সাবধানতা অবলম্বন করতে যেভাবে আগুন থেকে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করা হয়। যেহেতু এক্ষেত্রে পর্দা বজায় রাখা অনেক কঠিন, এখানে সাবধানতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ব্যাবস্থা। কিন্তু আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় শ্যালিকা বা দেবরদের সাথে দুলাভাই ভাবীদের আজেবাজে দুষ্টুমী করতে, পাশে বসতে বা গায়ে হাত দিয়ে কথা বলতে! এই বিষয়ে কেউ কিছু বললে আমরা খুব রেগে যাই বা অপমানিত বোধ করি। আমরা মনে করি এই বিষয়ে এভাবে ভাবাটা নোংরা মানসিকতার পরিচায়ক। কিন্তু এই কথাটা আমাদের মাথায় খেলেনা যে আমরা সবাই মানুষ, তাই কেউ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নই। আপনজনদের নিরাপত্তার জন্য এক্ষেত্রে আমাদের আল্লাহর নির্দেশিত পথ অনুসরন করাটাই শ্রেয় কারণ সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন সৃষ্টবস্তুর গুনাগুন সম্পর্কে।

বিয়ে কেবল একটা মৌখিক সম্মতি, একটুকরো কাগজ, একটা সামাজিক অনুষ্ঠান- যতক্ষণ না উভয় ব্যাক্তি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং এই সম্পর্ককে স্থায়ী করার জন্য বুঝেশুনে অগ্রসর হয়। নাটক সিনেমা দেখে আমাদের একটা ধারণা হয়ে যায় যে বিয়ে হোল সব সমস্যার শেষ আর সুখের শুরু। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও তেমন নয়। ব্যাপারটা এমনও নয় যে দেখতে ভালো হলে, সুন্দর জামাকাপর গহনা মেকাপ পরে সেজেগুজে থাকলেই বিয়ে সুখের হয়। দু'জন মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা দুই পরিবেশ, দু'টো পৃথক পারিবারিক পরিমন্ডল থেকে এসে "happily ever after" টিকে যাওয়া এতটা সহজ নয়। এর জন্য দু'জনকেই প্রতিদিন প্রতিটা মূহূর্ত চেষ্টা করতে হবে একে অপরকে বোঝার, পরস্পরের সুবিধা অসুবিধা রুচি পছন্দ জানার এবং তাকে সম্মান করার, পরস্পরের পরিবারকে আপন করে নেয়ার। দু'জনকেই সাহায্য করতে হবে একে অপরকে আলাপ আলোচনা সহযোগিতা করে। সবচেয়ে বড় কথা প্রেম

সম্পর্কে নাটক সিনেমার বানোয়াট ধারণা ঝেড়ে ফেলে বুঝতে হবে সবার আগে এটা একটা খুব ভালো বন্ধুত্ব- যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সম্প্রীতি আর সম্মানের মজবুত ভিত্তির ওপর, যা পাকা চুল আর ঝুলে পড়া চামড়ায় পরিবর্তিত হয়ে যায়না।

বিষ বিষই, মধু না

শুনেছি, যারা একটু তথাকথিত দ্বীনদার (?) বয়ফ্রেন্ড, তারা তাদের গার্লফ্রেন্ডকে নিয়মিত পর্দার দাওয়াত দেন, একটু ঢেকে ঢুকে চলতে বলেন, ছেলে ক্লাসমেটদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকেন!

অনেক সময় প্রচন্ডে দুঃখে হাসি আসে। আমরা ভাল কিছু দেখলে বলি, মাশাআল্লাহ (আল্লাহ যেমন চেয়েছেন) তেমনই হয়েছে। এখানে আমরা বলতে শিখি মাশাশয়তান! কারণ সে যেমন চেয়েছিল হুবুহু তেমনই হয়েছে।

আপনি আপনার গার্লফ্রেন্ডকে পর্দার দাওয়াত দিচ্ছেন অথচ আপনি বুঝলেন না যে আপনি নিজেই তো তার জন্য পর্দা খেলাফের প্রধান কারণ!

- উনার সৌন্দর্য্য দেখার বাকী ছেলেদের যেমন অধিকার নেই, একইভাবে আপনারও অধিকার নেই।

- উনার সাথে কথা বলার বাকী ছেলেদের যেমন অধিকার নেই, একইভাবে আপনারও অধিকার নেই।

- উনার সাথে ঘুরাফিরা করার বাকী ছেলেদের যেমন অধিকার নেই, একইভাবে আপনারও অধিকার নেই।

তার জন্য বাকী সব গাইরে মাহরাম ছেলে আর আপনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।
আপনি বলবেন, 'আমি বয়ফ্রেন্ড, আমি স্পেশ্যাল। আমি আর বাকীরা এক হলো?'

কথায় যুক্তি আছে। আপনি আসলেই স্পেশ্যাল। তবে কোনদিক দিয়ে স্পেশ্যাল, জানেন?

আপনি তার জন্য অন্যদের থেকে স্পেশ্যাল এই একটা দিক দিয়ে যে **বাকী ছেলেদের থেকে আপনি তার ফিতনা ঘটাচ্ছেন বেশি, বাকীদের থেকে তুলনামুলক আপনিই তার বেশি ক্ষতি করছেন**। ফিতনা সমূহের মধ্যে আপনি তার জন্য স্পেশ্যাল ফিতনা।

বাকী কেউ হয়ত তার সৌন্দর্য্য দেখছে আর আপনি তো তার সৌন্দর্য **'উপভোগ'** করছেন।

আপনি বাকীদের থেকে ঢেকে ঢুকে চলতে বলছেন, কেন আপনি একা দেখবেন বলে? আপনাকেই এই দেখার অধিকার কে দিয়েছে? আপনি তার স্বামী?

আপনি বলবেন, 'স্বামী হবো'। কিন্তু বিয়ে পর্যন্ত আপনি বেঁচে থাকবেন **এই গ্যারান্টি আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন**? আপনার সাথেই তার বিয়ে হবে এবং হবেই এই গ্যারান্টিই আপনাকে কে দিয়েছে? আপনি কিভাবে জানেন যে আপনিই তার Soul Mate? কেন আপনি অন্য কারোর (যে তার স্বামী হবে) হক নষ্ট করছেন? বিয়ে হলেও বিয়ের আগে এই পাপের শাস্তি কি হবে তা কি জেনে করছেন? জাহান্নামের শাস্তি দুধভাত মনে হয়? ভয় লাগে না?

এখন আপাতত প্রেম করে নেই, পরে তওবা করে ফেলবো, এই নিয়ত করে রাখছেন? যদি সে সময় না পান? আর এভাবে যে ভেবে রেখেছেন, তাহলে এটা কি আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করা হল না? আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দেওয়ার চিন্তা করেন কিভাবে? নিজেকে খুব চালাক মনে হয়?

আপনি বলবেন, 'আমাদের বাসায় জানে, বিয়ে ঠিক করা'। ওয়াল্লাহি এমন অসংখ্য রেকর্ড আছে যে এসব প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত টেকেনা। অনেকে মনে করে, শারীরিক সম্পর্ক করে ফেলি তাহলে সম্পর্ক টিকবে। আরে তাহলে তো আরোই টিকেনা কারণ অবৈধ প্রেম হয়ই চেহারার ফ্যান্টাসি আর শারীরিক মোহে। স্বার্থোদ্ধার হয়ে গেলের

যেকোন এক পক্ষ থেকে অনাগ্রহ সৃষ্টি হওয়া শুরু করে। মধ্যখান থেকে ব্যাভিচারের মত জঘন্য পাপ সংঘটিত হয়ে যায়। তাই এসব অবৈধ হারাম সম্পর্কে জড়িত থেকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি না দিয়ে বরং বিয়ের পর সুখে দুঃখে দুজন একসাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন, তা বাস্তবায়নে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা সাহায্য করবেন।

বাকী কেউ তার সাথে কথা বলে তার মৌখিক পর্দা লংঘন করিয়ে গুনাহ করছে ও তাকেও করাচ্ছে আর আপনি তার সাথে রসিয়ে রসিয়ে দিনরাত প্রেমালাপ কখনও বা খুব ডিপ কিছু নিয়ে আলোচনা করছেন যা একসময় অশ্লীল কথাবার্তার রূপ নিচ্ছে, আপনি তাকে কয়েকশ গুণ বেশি গুনাহ করাচ্ছেন।

আপনার সাথে থেকে তার একই সাথে দৃষ্টির পর্দা, শরীরের পর্দা, মৌখিক পর্দা, চলাফেরার পর্দা ইত্যাদি সবধরণের পর্দা খেলাফ হচ্ছে। তাছাড়া বাবা মা কে না জানিয়ে সম্পর্ক করায় বাবা মাকেও তার ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে কেবল আপনার কারণেই। আপনি তো ভাই তাকে নিজ দায়িত্বে জাহান্নামে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন! মাশাশয়তান।

হ্যা আপনাকেই বলছি।

এই আপনি মুখে তাকে বলছেন 'ভালবাসি, তোমার ভালো চাই' অথচ কী আশ্চর্য আপনি নিজেই তাকে একটা প্রশ্নবিদ্ধ রিলেশনে জড়িয়ে তার দিন দুনিয়ার ক্ষতি তো করছেনই এবং কেয়ামতেও সবার সামনে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করে দিয়েছেন। এ কেমন ভালবাসা বা ভাল চাওয়া?

আপনার গার্লফ্রেন্ডের পর্দা লংঘনের এবং ফিতনার সবথেকে বড় কারণ আপনি নিজেই। আপনি তার মোটেও ভাল চান না, বরং আপনি নিজের অবৈধ গাইরাতের কারণে নিজের স্বার্থে তাকে পর্দা করতে দাওয়াত দেন, ঢেকে ঢুকে চলতে বলেন।

আপনি সত্যিই তার ভাল চাইলে, তার পথ থেকে সেগুলো সরান যেগুলো তার ফিতনার কারণ। আর এই লিস্টে সবার প্রথমে রয়েছেন আপনি নিজে। সবার প্রথমে তাই নিজেকে তার জীবন থেকে সম্পূর্ণ সরান।

তারপর বোনদেরকে দাওয়াত দেবার জন্য মাশাআল্লাহ অনেক দ্বীনি বোনরা রয়েছেন। কোন মাহরাম আত্মীয়া দ্বারা তাদের সাহায্য নিয়ে তার কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিন। আপাতত এ ধরণের দাওয়াত টাওয়াত দেওয়া ছাড়ুন। দাওয়াত দিতে মন উসখুস করলে বরং নিজের নফসকে দাওয়াত দিন নফস যেন বিয়ে ব্যতীত এবং বিয়ের পরেও স্ত্রী বাদে কোন পরনারীর প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি থেকে পর্দা করে (বিরত থাকে)।

ফ্যান্টাসি

বিয়ের আগে প্রেম করা আর বিয়ের পর সংসার করা-দুটো ভিন্ন জিনিস। বিবাহপূর্ব প্রেম একটা ফ্যান্টাসি। এখানে ছেলে-মেয়ে উভয়েই নিজেকে সর্বোচ্চ উৎকৃষ্টরূপে উপস্থাপন করতে চায়। কদিন পরপর দেখা বা সপ্তাহে একদিন ডেটিং - ছেলেটি নিজের সামর্থ্যের সেরা উপস্থাপনটিই নিয়ে আসতে চায়, মেয়েটিও চায় তার প্রেমিক তাকে পরম সুন্দরী হিসেবেই দেখুক। তাই প্রেমের দিনগুলোতে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের নেতিবাচক ব্যাপারগুলো পরস্পরের কাছে প্রকাশ পায়না, দুজনেই তা যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

সংসার জীবন আলাদা ব্যাপার। এখানে নিত্যদিনের অভ্যাস প্রকাশ পাবে, কৃত্রিম ভালোমানুষির পর্দা উন্মোচিত হবে। চব্বিশঘণ্টা একটা মানুষের সাথে থাকলে তাকে বোঝা যায়, চেনা যায়, সত্যিকারভাবেই চেনা যায়। প্রেমের সময়ের মত ক্ষণিকের দেখা আর ভাববিনিময়ের মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি সহজাত আকর্ষণের চাপল্যভরা মোহনীয় সময়টা তাই সংসারজীবনে থাকেনা। সংসারজীবনে আবেগের চেয়ে বাস্তবতার ভূমিকা বেশি। ভার্সিটির গেট থেকে বেরোলে যে মুখটি দেখার জন্য আকুলতা থাকত, জীবনযুদ্ধের সংগ্রামরত দিনরাতের সংস্পর্শ সেই আকর্ষণটা আর রাখেনা। নির্জনে বসে প্রেয়সীর হাত ধরে যে রোমান্টিসজমে বুঁদ হওয়া সহজ, বিবাহিতজীবনে সারাদিন অফিস করে বাড়ি ফিরে কানের কাছে বাচ্চা ছেলের ঘ্যানঘ্যান আর বউয়ের অভিযোগের ফিরিস্তি শোনার মুহূর্তে সেই রোমান্টিসিজম থাকেনা। মনে ঘোরে একই কথা - "তোমাকে তো বিয়ের আগে এমন মনে হয়নি!"

প্রেমের সম্পর্কগুলো ক্ষণিকের ভালোলাগা থেকে গড়ে ওঠা। ওটা আর একটা মানুষের সাথে জীবন কাটিয়ে দেওয়া এক ব্যাপার না। এজন্য যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ধৈর্য আর ত্যাগের দরকার সেটা তথাকথিত প্রেমের সম্পর্কে কখনোই গড়ে ওঠা সম্ভব না।

দাম্পত্য জীবনের সমস্যাগুলো একে অন্যের সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে সমাধান হয়ে যায়না। মনোমালিন্যের সময়টাতে পার্কে বসে ফুল বিনিময়ের স্মৃতিচারণে খেদ দূর হয়না, আরো বাড়ে।

সেক্যুলাররা প্রায়ই অ্যারেনজড ম্যারেজের দুর্নাম করতে গিয়ে বলে-'ছোটবেলা থেকে আমরা শিখি অচেনা মানুষের দেওয়া খাবার না খেতে, অথচ অ্যারেনজড ম্যারেজের মাধ্যমে একজন অচেনা মানুষের সাথে বিছানায় শুতে বাধ্য করা হয়!' অচেনা মানুষই বটে। যেমন জনৈক 'বুদ্ধিজীবি' বলেছিলেন বিয়ের আগে অন্তত তিনবছর প্রেম করে পরস্পরকে 'চিনে' নেওয়া দরকার। মারহাবা।

এই 'চিনে নেওয়া' কতটা সম্ভব **সেটা প্রেম করে বিয়ে করা দম্পতিদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়**। সাময়িক ভালোলাগা আর মা-বাবার পকেট ফাঁকা করা ফূর্তির দিনের উপলক্ষই যদি 'চিনে নেওয়া' হত তাহলে আর বিয়ের পর প্রিয় মানুষটির 'অন্যরূপ' দেখে কেউ হতাশ হত না।

বস্তুত বিয়ের আগের প্রেমের সময়টাতে শয়তান একে অন্যকে বিউটিফাই করে, ফলে হারাম সম্পর্কের মোহ যেমন বাড়ে তেমনি পরস্পরের আসল রূপ ঢাকা পড়ে থাকে। বিয়ের পর শয়তান সরে যাওয়ায় তা সামনে এসে পড়ে। তখন এতদিন ধরে 'চেনা' মানুষটিকেই 'অচেনা' লাগে।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপরে যে আপনার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়, সে আপনাকে সুখী করতে পারবেনা, কোনদিন না। আর আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রেখে, তাঁরই নির্দেশিত পন্থা মোতাবেক জীবনসঙ্গীনীর দ্বীনদারিতাকে প্রাধান্য দিয়ে যে ছেলে একটা 'অচেনা' মেয়ের হাত ধরতে পারে, আল্লাহ্‌তার জীবনে একটা ম্যাজিক দিয়ে দেন। সেই ম্যাজিকের বলে নিতান্ত সাধারণ চেহারার মেয়েটি তার চোখে রাজকন্যার চেয়ে লাবণ্যময়ী হয়ে ওঠে,

সন্তানেরা চক্ষুর শীতলতা হয়ে ওঠে। দ্বীনের পথে চলা স্বামী-স্ত্রীর জীবনে বিলাস থাকেনা, বাহুল্য থাকেনা, কৃত্রিমতা থাকেনা; যেটা থাকে তার নাম শান্তি।

শান্তি সবাই খোঁজে। বেশিরভাগই খোঁজে শান্তির যিনি মালিক, তাঁকে অসন্তুষ্ট করে। আফসোসের বিষয়ই বটে।

জীবন্ত মৃত

আমি নুজাইরাহ। আজ আমার বিয়ে। বিয়ে পুরোপুরি ঠিক করার পর আব্বু আমার মতামত শুনতে চেয়েছিলো একবার। বড্ড হাসি পাচ্ছিলো!

আমার "হ্যা, না" জবাব উনি তখনই শুনতে চেয়েছে যখন 'না' বলার দরজা বন্ধ প্রায়। বাবার কথার কোন উত্তর দেই নি। নীরবতাকে সম্মতির বহিঃপ্রকাশ মনে করে বাবা চলে গেছে। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে মাকে বলেছিলাম,

মা, লোকটার যে দাড়ি ছিলো না, টাখনুর উপর প্যান্টও নেই! দ্বীন সম্পর্কে কি পরিপূর্ণ ধারনা আছে তার? আমাকে কি পরিপূর্ণ পর্দা করতে দিবে?
মায়ের জবাবটা এমন ছিলো-

"ছেলেটা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। দশ গ্রামে ছেলেটার ভালো নাম। এতো ভালো চাকরী করে। তোর পর্দা, তোর কাছে। ও তোকে বাধা করবে কেনো!"

আমি বরাবরের মতো আজও বাবা মায়ের একটু বেশিই বাধ্য সন্তান! তাই বিয়ের আয়োজন নির্বিঘ্নে এগিয়ে চললো...

এই পরিসরে আমি আমার সম্পর্কে একটু বলে বলে নেই, খুব ইসলামিক নয় এমন সামাজিক একটা পরিবারে আমার জন্ম।এখানে কেউ দ্বীন মেনে চললে, সবাই খুশি হয়, কিন্তু না মানলেও খুব একটা রাগ করে না। সেই সুবাদে আমার পর্দা করতে কোন সমস্যা হয় নি এখানে।

গত দু'বছর আগে, পর্দা সম্বন্ধে, ইসলাম সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানতাম না! কিন্তু আমার এক দ্বীনদার বান্ধবীর কাছে এসব সম্বন্ধে অনেকটাই জেনেছি। খুব ভালো লেগেছে

আল্লাহর দেওয়া প্রতিটা বিধি নিষেধকে। তাই নিজেরই জীবনে সেগুলো বাস্তবায়নে আপ্রান চেষ্টা করেছি দুইটা বছর। অনাবিল এক শান্তি আছে, আল্লাহকে হুকুমদাতা মেনে নিতে পারায়। এটা খুব বুঝেছি এই দুই বছরে।

আমি এখন শ্বশুর-বাড়িতে। সবাই বেশ ভালোই। এ বাসাটা একেবারে গ্রামে। বিশাল আঙিনা।

চাকরির সুবাদে শহরের যাওয়ার কথা উঠলেও বৃদ্ধ শ্বশুর-শ্বাশুড়িকে রেখে যাওয়াটা ভালো লাগছিলো না। তাই এখানেই থাকা। বাসার সদর দরজাটা সব সময় খোলাই থাকে, কে কখন বাসায় ঢুকে বলাই যায় না। পরিবেশটা খুব অস্বস্তিকর লাগে আমার কাছে। আমার দেবর-ভাসুরের সামনে গেলে উড়নার একপাশটায় মুখটা ঢেকে দেই।

কিন্তু বিষয়টা কারও কাছেই ভালো লাগে না তেমন!

সেদিন আমার উনি তো বলেই দিলো, "এটা কি বেশি বেশি নয়। ওরা তো বাড়িরই লোক। আর মুখ খোলা রাখাটা কি জায়েজ নয়"।

তারপরও একতরফা সংগ্রামটা করেই গেলাম কিছুদিন। কিন্তু লাভ হলো না।

রান্না করতে, কাপড় মেলতে অথবা বাবাকে চা দিতে গিয়ে একবার না একবার গায়রে মাহরামদের সামনে পড়তেই হচ্ছে!!

আজ দুপুরে গোসল সেরে ফ্যানের নীচে চুল শুকাচ্ছিলাম। অবশ্য এসময়ে ঘরের দরজাটা লাগিয়েই দিতাম। কিন্তু কাল মা বলল, "দিনের বেলায়ও দরজা লাগানোর কি প্রয়োজন?"

তাই আজ খোলাই ছিলো দরজাটা। আজ হঠাৎ আমার ছোট দেবর ঘরে ঢুকে পড়ল। আমাকে দেখে একগাল হেসে বলল,

“ভাবী আজ তো তোমার চুলও দেখে ফেললাম! তারপরে আরও একতরফা হাসতে হাসতে বলল, ভাইয়ার নেইলকাটার টা নিতে এলাম, দাও তো”
অগত্যা নেইল কাটার টা এগিয়ে দিয়ে ধপ করো বসে পড়লাম বিছানায়। কান্না এলো, খুব করে কান্না এলো।

কিন্তু কাঁদারও বেশি সময় নেই যে। মা ডাকছে বাবাকে ভাত বেড়ে দিতে হবে। এভাবেই চলছে দিনগুলো....

হঠাৎ একদিন আমার দেবরের এক বন্ধু বাসায় এলো। আঙিনায় কাজ করছিলাম। বুঝতেই পারি নি পেছন থেকে কখন এসে পড়েছে। হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালো! ওড়না দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেললাম। তবে দেরী হয়ে গেলো! ছেলেটা আমার চেহারা ভালো করেই দেখেছে। কমেন্ট করতেও ভোলে নি!

"বাহ্! ভাবীর চেহারাটা তো বেশ্ মিষ্টি!"

আমি তখন পুরো বোবা বনে...!

পর্দা করার পর থেকে কেউ আমাকে সুন্দর, কিউট, মিষ্টি বলার সুযোগটাও পায় নি কোনদিন!

ইশ্, আমি বুঝি অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি! কই বুক ফেঁটে কান্নাটা তো আসছে না আর! তবে আজ সারাদিন ছেলেটার "মিষ্টি" কথাটা বুকের মধ্যে হাতুড়ির আঘাত করেছে অবিরাম। কোন কাজেই শান্তি পাচ্ছি না।

আমার বিয়ের দু'বছর হলো।

আমি নার্সিং হোমে আজ। কাল সিজার করে আমার এক ছেলে হয়েছে। আমি এখন পুরোই সয্যাশায়ী! নড়তে পারছি না। আমার স্বামীই আমার দেখাশোনা করছে। আজ আমার ননদ আর ননদের স্বামী এসেছে আমাকে দেখতে! আমার গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে দেওয়া আছে! নড়তে না পারলেও বুঝতে পারছি, আমার পা দুটো টাখনু পর্যন্ত বাইরে বেড়িয়ে আছে। আমার ননদের স্বামী আমার পায়ের দিকের সোফায় গিয়ে বসল! আমি যখন তার দিকে তাকালাম তখন দেখি তার চোখ'দুটো আমার পায়ের দিকেই নিবদ্ধ! এখন তো আমার শক্তি নেই আমার পা দু'টোকে ঢেকে দেওয়ার!!

আর ওকে(স্বামী) বলার মতো কোন ইচ্ছেই নেই এখন! এটা তার কাছে নিছকই ছেলে মানুষিই মনে হবে!

অতীত স্মৃতি গুলো কেনো জানি খুব মনে পড়ছে আজকে। যখন থেকে শুনেছি, এই পা দুটো ঢাকাও ফরয। তখন থেকে কতনা বিড়ম্বনার মধ্যে ও পা দুটোকে ঢেকে রেখেছি। মোজা না পড়ে কখনই বাড়ি থেকে বের হয় নি। আজ যে পারলাম না!

আজ আমার সিজারের পাঁচদিন হলো। এখনো একা-একা হাঁটতে পারি না। আমার হাজবেন্ড আমার বাহুটা ধরে, বাথরুমে নিয়ে যায়। আজও তাই হচ্ছিলো। কিন্তু হঠাৎই তার মোবাইল বেজে উঠল। তাই জরুরী ফোন কিনা!

তাই উনি আমার দেবরকে আমাকে ধরতে ইশারা করে, দ্রুতই বেলকোণিতে চলে গেলো! এবার আমার দেবর, আলতো করে ধরলো আমার বাহুটা!!!

ইশ্ আজ যদি সুস্থ থাকতাম দৌড়ে পালিয়ে নিজেকে বাঁচাতাম। কিন্তু সে শক্তি যে নেই আমার শরীরে! হঠাৎই মনে হলো,

আল্লাহ! নন মাহরামের হাতের স্পর্শ পাওয়ার আগেই, যদি ঐ অপারেশন টেবিলেই চলে যেতাম তোমার কাছে! ভালো হতো না কি!

না, হতো না হয়তোবা! তাই বেঁচে আছি।
আলহামদুলিল্লাহ!

আমি এখন বৃদ্ধাপ্রায়। ২৫ বছর কেটে গেলো বিয়ের। আমার ছেলের বয়স ২৩বছর। আমার আরও একটা মেয়েও হয়েছে। ওর বয়স ২০।

আজ খাবার টেবিলে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললাম, "বাবা, দাড়িটা আর কাটিস না, রেখে দে"। একটা হাসি দিয়ে ছেলে আমাকে বলল, "বাবার আগেই আমি দাঁড়ি রাখবো!"

তার এই কথাটার যুতসই কয়েকটা জবাব জানা ছিলো। কিন্তু না, বলা যাবে না!
আমার 'উনিও' তো এখনো দাড়ি রাখেনি! ছেলেকে বলতে গিয়ে, যদি ছেলের বাপ কষ্ট পেয়ে যায়!

বেলকোণিতে দাড়িয়ে, ঐ বিশাল আকাশটা দেখছি। আজ ২৫বছর পর! তোমার কথাগুলো খুব মনে পড়ছে মা। তুমি না বলেছিলে সব ঠিক হয়ে যাবে! কই মা, কিছুই তো ঠিক হলো না! উল্টো তোমার মেয়েটাই এখন জীবন্ত লাশ! যৌবন বয়সটাও ঠিকঠাক পর্দা করা হলো না, তোমার মেয়ের!!

তবে জানো মা! একটা জিনিস ঠিকই ছিলো! তোমার মেয়েকে কোনদিন অভাবের ছিটে ফোটাও দেখতে হয় নি! তোমার জামাই তো আজও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে!! কিন্তু তারপরে ও বুকের ভিতরে একটা বিশাল শূণ্যতা। **আমি তো শুধু কোন নামাজীকে বিয়ে করতে চাই নি! আমি একজন সাহাবাকে বিয়ে করতে চেয়েছি!** যে নিজের জীবনের চেয়েও ভালোবাসবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে(সাঃ)।

জানো মা, আজও আমার মনে হয়, যদি চলে যেতে পারতাম, ২৫ বছর আগের দিনগুলোতে! ছোট্ট নুজাইরার, বোরকা নিকাবগুলো যদি আবার ফিরে পেতাম! সেগুলোতে একটা শান্তির পরশ আছে মা! আল্লাহকে ভালোবাসার এবং তাঁর ভালোবাসা পাবার এক অনাবিল শান্তি.....!

বিবিধ প্রশ্ন

প্রশ্ন ১: ওর সাথে ফিজিকাল রিলেশন হয়ে গেছে? খুব খারাপ লাগছে? এখন কী করণীয়?

- রাসূল (সা) বলেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ জিনায় লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ সে মুমিন থাকে না" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নংঃ ৫৭)

তাই যখন কেউ জিনায় লিপ্ত থাকে, সে আসলে মুমিনই ছিল না। তাকে **আন্তরিকভাবে** তওবা করতে হবে। রাসূল (সা) বলেছেন, "যে গুনাহ থেকে তওবা করে সে এমন হয়ে যায়, যেন সে গুনাহটি করেই নি"। (ইবনে মাজাহ, হাদিস নংঃ ৪২৫০)

তওবার শর্ত তিনটিঃ

১। সেই গুনাহ পুরোপুরি ছেড়ে দেয়া।
২। গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।
৩। আবার গুনাহে লিপ্ত না হবার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

তওবা যেন কবুল হয় সে জন্য বেশি বেশি গোপনে দান করা উচিত, গোপনে ইবাদত করা উচিত। এগুলো আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ মিটিয়ে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ যে প্রাণকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর যারা ব্যভিচার করে না। আর যে তা করবে সে আযাবপ্রাপ্ত হবে। কিয়ামাত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়।

তবে-

তারা নয় যারা তওবা করবে, ঈমান আনবে, আর সৎ কাজ করবে। আল্লাহ এদের পাপগুলোকে পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেবেন; আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎ কাজ করে সে সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়" [২৫:৬৮-৭১]

প্রশ্ন ২: আমার কি এখন ওকেই বিয়ে করতে হবে? বিয়ে করলে কি আমার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে?

- যার সাথে জিনায় লিপ্ত হয়েছে তাকেই বিয়ে করতে হবে এমন যেমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই, একইসাথে তাকে বিয়ে করলে যে গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, এমন দলীলও নেই। গুনাহ মাফের জন্য **আন্তরিক** তওবাই যথেষ্ট।

প্রশ্ন ৩: আমি জিনা করে ভুল করেছি। এখন বিয়ে করে ওকে পেতে চাই। করণীয় কী?

- আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে নিজে ব্যভিচারী সে তো কেবল ব্যভিচারিণী আর মুশরিক নারীকেই বিয়ে করে। আর যে ব্যভিচারিণী সে ব্যভিচারী অথবা মুশরিককে ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে" [২৪:৩]

প্রথমে আয়াতটা শুনতে একটু অদ্ভুত লাগতে পারে। কথাটার মানে কী? ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী আর মুশরিকক নারীকেই বিয়ে করে? শায়খ সাদী (রহ) তার তাফসীরে সুন্দর করে এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। যে জানা সত্ত্বেও কোন তওবা না করা ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করতে চায় তবে তার ব্যাপারে কেবল দুটি কথাই খাটে-

১। হয় সে নিজে ব্যভিচারী তাই আরেকজন ব্যভিচারিণী বিয়ে করতে তার সমস্যা হচ্ছে না। রুচিতে বাধছে না।

২। কিংবা সে হয়তো ব্যভিচারী না। কিন্তু সে আসলে হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না। আল্লাহ্ও তাঁর রাসূল (সা) যে বিধান দিয়েছেন তা নিয়ে তার কোন মাথা ব্যাথা নেই। যার অর্থ, সে অবশ্যই একজন মুশরিক। [তাফসীরে সাদি, ১/৫৬১]

এটা কোনো ব্যভিচারী পুরুষের ব্যাপারে যেমন খাটে, ব্যভিচারিণী নারীর ব্যাপারেও খাটে।

তাই যদি নিজে তওবা করার সাথে সাথে যদি অপরজনও তওবা না করে, তবে বিয়ে বৈধ হবে না। তবে দুইজন অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলে চাইলে বিয়ে করতে পারে। সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে, উক্ত জিনাকারী নারী গর্ভবতী কিনা! মাসিকের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। গর্ভবতী হলে সন্তান জন্মদান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর গর্ভবতী না হলে বিয়ে করা যাবে।

প্রশ্ন ৪: আগে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলাম। বিয়ের পর অতীতে করা ব্যভিচারের জন্য অনুতপ্ত। এখন কী করণীয়?

- আলেমগণ বলেন, যদি কোনো ব্যভিচারিণী ব্যভিচার করেনি এমন পুরুষকে বিয়ে করে আর বিয়ের পর নিজের ভুল বুঝতে পারে, তবে উত্তম হচ্ছে তাদের আবার বিয়ের ব্যবস্থা করানো। তবে নতুনভাবে বিয়ে পড়ানো হলে, স্বামী ব্যভিচারের কথা জেনে ডিভোর্স দিতে পারে এমন আশঙ্কা থাকলে গোপন রাখা যাবে। আশা করা যায়, আল্লাহ এ বিয়েকে বৈধতা দিবেন এবং তাকে মাফ করে দেবেন।

প্রশ্ন ৫: জিনায় লিপ্ত হয়ে গর্ভবতী হয়ে গিয়েছি। এখন যদি এবোর্শন করাই, সেটা কি হালাল হবে?

- না, হবে না। বরং, দুটো গুনাহ তার ওপর বর্তাবে। প্রথমটা ব্যভিচারের। দ্বিতীয়টা, ভ্রূণ হত্যার। যদিও কোনো কোনো আলেম, ভ্রূণের বয়স ৪০ দিন পার না হলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবোর্শনের অনুমতি দিয়েছেন। তবে সেটা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে। অবৈধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে না।

কিছু কিছু ব্যাপার বৈধ ক্ষেত্রে হালাল হতে পারে, কিন্তু অবৈধ ক্ষেত্রে সেটা হারাম হয়ে যায়। যেমনঃ মুসাফির চাইলে পরে রোযা কাযা করে নিতে পারে। কিন্তু সেই মুসাফির যদি মদ কিংবা অন্য কোনো হারাম কিছু করার জন্য মুসাফির হয়, তবে তার সিয়াম কাযা করার অনুমতি নেই।

তাই তাকে উক্ত সন্তান জন্ম দিতে হবে। আর সে সন্তানের কোনো পিতার পরিচয় থাকবে না। তার দায়িত্ব থাকবে সরকার প্রধানের। যেসব দেশে ইসলামী সরকার প্রধান নেই, সেসব দেশের ক্ষেত্রে কী করণীয় তা সেসব দেশের আলেমদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে।

প্রশ্ন ৬: আগে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলাম কিংবা অবৈধ সম্পর্ক ছিল। এটা কি বিয়ের পর সঙ্গীকে জানাতেই হবে?

- না, জানানোর প্রয়োজন নেই। উত্তম হচ্ছে আল্লাহ যে গুনাহ গোপন রেখেছেন, সে গুনাহ গোপনই রাখার। কিন্তু যদি আপনার হবু স্বামী আগে থেকেই এই কন্ডিশন দিয়ে রাখেন যে, তিনি কোনো ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক না, সেক্ষেত্রে আপনার তাকে বিয়ে করা উচিত হবে না। কারণ, এক সময় তিনি ঠিকই জেনে যাবেন।

আপনার উচিত হবে এমন কাউকে বিয়ে করা **যিনি আপনার অতীতের চেয়ে বর্তমানকে বেশি গুরুত্ব দিবেন**। মাঝে মাঝে আঁধার অতীতের মানুষেরাই সোনালী ভবিষ্যতের সূচনা করে।

প্রশ্ন ৭: আগে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলাম। ছেলেটা ভালো ছিল না। তাই বাসার চাপে আরেক জায়গায় বিয়ে করেছি। আমার বিয়ে কি বৈধ?

- যদি আন্তরিকভাবে তওবা করে বিয়ে করে থাকেন, তবে বিয়ে বৈধ। আর যদি তওবা না করেন, তবে যার সাথে জিনায় লিপ্ত ছিলেন, তাকে বিয়ে করাও বৈধ না।

প্রশ্ন ৮: বিয়ের পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি। সে ব্যভিচারের দরুণ গর্ভবতী। এখন অনুতপ্ত। কী করণীয়?

- বিয়ের পর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া খুবই গর্হিত কাজ। আমাদের দেশে এ জঘন্য গুনাহের কাজকে আদর করে 'পরকীয়া' বলা হয়। ইসলামে বিয়ের আগে জিনা করলে তার শাস্তি বেত্রাঘাত। কিন্তু বিয়ের পরে জিনা করার একটাই শাস্তি। পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড। কিয়ামতে আল্লাহ এ ধরনের লোকদের ভয়াবহ শাস্তি দিবেন।

তবে উক্ত নারী ভুল বুঝতে পারলে তওবা করবে। সেক্ষেত্রে, তার স্বামীকে জানানোর প্রয়োজন নেই। উক্ত সন্তান তার স্বামীর পরিচয় বহন করবে।

প্রশ্ন ৯: বিবাহিত মেয়ের সাথে ব্যভিচার করেছি। তারপর তাকে ডিভোর্স করিয়ে বিয়ে করেছি। এখন আমরা অনুতপ্ত। আমাদের বিয়ে কী বৈধ? কী করণীয়?

- এরা তিনটা খারাপ কাজ করেছে। ব্যভিচার করেছে। বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করেছে। আরেকজনের স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করেছে। রাসূল (সা) তাঁর হাদিসের মাধ্যমে জানিয়েছেন, যে আরেকজনের স্ত্রীর মাথা বিগড়ে দেয়, সে রাসূলের (সা) দলভুক্ত না।

এটা এতোই গর্হিত কাজ যে, মালেকী মাজহাবের কিছু আলেম বলেছেন, আজীবনের জন্য এদের বিয়ে অবৈধ। তবে অধিকাংশ আলেমদের মত হচ্ছে, এরা যদি এরপরেও আন্তরিকভাবে তওবা করে তবে আল্লাহ পরম দয়াময়।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ঃ উত্তরগুলো কখনো ছেলে আবার কখনো মেয়েকে উদ্দেশ্য করে দেয়া হয়েছে। তবে ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্যই একই বিধান। উপরের উত্তরগুলোর কারণে, কারো যেন এমন না মনে হয়, ব্যভিচার খুব সহজ একটি গুনাহ। অন্যান্য গুনাহের মত তওবা করে নিলেই হবে, এখন জিনা করতে থাকি। **এ ধরনের মানসিকতা নিয়ে চললে, তওবা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন**। আর তওবা করলেও দেখা যাবে সে তওবা আন্তরিক হবে না। এমন হতে পারে, শুধু এ গুনাহের কারণে মৃত্যুর সময় ঈমানহারা হয়ে মরতে হচ্ছে। আর আখিরাতের আযাব তো বহুগুণ বেশি।

তওবা নিয়ে 'ডাঃ শামসুল আরেফিন' ভাইয়ের 'কুররাতু আইয়ুন ২' বইয়ের 'নীল কৃষ্ণগহ্বর' প্রবন্ধ থেকে একটা উদাহরণ টানা যেতে পারে –

"এক গ্রামের মহিলা শীতের শেষে শীতের কাপড়চোপড়-কম্বলটম্বল জ্বাল দিবে। সারাবছরের জন্য তুলে রাখতে হবে তো, তাই। এজন্য বড় ডেকচিতে পানি গরম দিচ্ছিল। হঠাৎ মায়ের কী যেন মনে হল, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে একটু উঠোনে গেল, ধরেন বাথরুমেই পেয়েছে। খেয়াল নেই যে পাকঘরের দরজা আটকাতে হবে। মা যখন টয়লেটে, এর মধ্যে আড়াই বছরের বাচ্চাটা মায়ের খোঁজে এসে ডেগচিতে পড়ে সিদ্ধ হয়ে ভাসছে। এখন মা ফিরে এসে পাকঘরে পা দিয়ে ডেগচির দিকে তাকিয়ে মায়ের প্রথম অনুভূতিটা কেমন হবে? হায়, আমি কী করলাম। হায় আমি কেন পাকঘরের দরজা আটকায়ে গেলাম না। এই অনুভূতিটা হল তাওবা। এক কঠিন অপরাধবোধ। ঐ মা, সারাজীবন এটা ভুলবে না, আরও ১০টা বাচ্চা হলেও এই ঘটনা ভুলবে না, এবং

আর কোনোদিন পাকঘরের দরজা না আটকে যাবে না। এই অনুভূতি আসা চাই গুনাহ হবার পর।

আর, তাওবার পর যদি গুনাহের কথা ভেবে মজা লাগে, তাহলে ধরে নেবেন তাওবা কবুল হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা আল্লাহর কাছে 'তাওবাতুন নাসুহা'র দুয়া করতে হবে, এমন তাওবা যা থেকে আর ফিরে আসা যায় না।"

"অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন, যারা ভুল করে খারাপ কাজ করে আর সাথে সাথেই তওবা করে। এদেরকেই আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। আর এমন লোকদের ক্ষমা নেই, যারা খারাপ কাজ করতেই থাকে, আর যখন মৃত্যু এসে যায়, তখন বলে, 'আমি এখন তওবা করলাম'। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কাফির অবস্থায় মারা যায়। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি" [৪:১৭-১৮]

IslamQA-এর নিম্নোক্ত ফতওয়া অবলম্বনে এটি লেখা হয়েছেঃ

1. Is it permissible for a woman who has committed immoral actions to abort the foetus? (https://islamqa.info/en/13331)

2. If a woman commits zina, then she is forced to marry a chaste man, is that marriage valid? (https://islamqa.info/en/199600)

3. Is it permissible for one who has committed zina (fornication or adultery) to get married after he or she has repented? (https://islamqa.info/en/14381)

4. Is it permissible to marry a woman who used to commit zina? (https://islamqa.info/en/85335)

5. He committed zina with a girl and wants to marry her, but her family are refusing and he has some questions. (https://islamqa.info/en/147808)

6. She advised him and he came to thank her, and they committed zina. (https://islamqa.info/en/60269)

7. She committed zina and got pregnant from a stranger. What should she do? (https://islamqa.info/en/94820)

8. He committed zina with a woman then incited her to get divorced from her husband, then he married her after they had both repented from this sin of zina, then they regretted what they had done. (https://islamqa.info/en/216521)

9. The punishment for zina (fornication, adultery) and how to keep oneself from going back to it (https://islamqa.info/en/20983)

10. He has repented from zina; does the hadd punishment have to be carried out on him? (https://islamqa.info/en/14528)

আঁকড়ে ধরো

“যদিওবা বইয়ের ফোকাসটা একটা বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিলো, তথাপি.....”

কয়েকজন লোক গেল একটা গুহার কাছে। গুহা দেখে সাথে সাথেই একজন বলে ফেলল এখানে সাপ আছে। এটা ফিতরাত, ফিতরাত দিয়েই সে বুঝে ফেলেছে সাপের উপস্থিতি। আরেকজন একটু আশে পাশে দেখল, সে অনেক sign পেল, সেসব sign দেখে সেও মত দিল গুহার ভেতর সাপ আছে। আরেকজন ফিতরাত দিয়েও বুঝল না, sign দেখেও বুঝল না তাই সে গুহার ভেতর যেতে চাইল। ঢুকেই সে দৌড় দিয়ে পালিয়ে এল, নিজ চোখে দেখে সে বুঝল আসলেই ভেতরে সাপ আছে। শেষের জন হতভাগা। সে ফিতরাত দিয়েও বুঝল না, sign দেখেও বুঝল না, ভেতরে ঢুকে নিজের চোখে দেখেও বুঝতে চাইল না, ভাবলো এ বোধহয় সাপ নয়, হয়ত অন্য কিছু, হয়ত...শেষ পর্যন্ত সে সাপের কামড় খেয়ে তবেই বুঝল আসলেই এটা সাপ ছিল! কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে, আর কিছুই করার নেই।

ইসলামের ব্যাপারগুলো অনেকেই ফিতরাত দিয়ে বুঝে ফেলে। যেমন আবু বকর (রাঃ)। আবু বকরের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, সব ঘোড়াই কোন না কোন এক সময় স্লিপ করে, সেটা যত ভালো নিখুঁতই হোক না কেন। কিন্তু আবু বকর কখনো স্লিপ করেনি।

অর্থাৎ আবু বকর দ্বীনের ব্যাপারে কখনোই কনফিউজড হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, “যার কাছেই আমি দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছি সবাই একটু না একটু দ্বিধায় পড়েছে কিন্তু আবু বকর কোন দ্বিধায় পড়েনি”। জাহিলিয়াতের যুগেও আবু বকর মদকে জায়েজ মনে করতেন না, তিনি কোনদিন মুর্তি পূজাও করেননি। আবু বকরের ফিতরাতই ছিল হক্বের উপর। যখনই তার কাছে দ্বীনের কথা বলা হয়েছে সে সাথে সাথেই বলেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

এরকম আরো ছিলেন আবু যর গিফারি (রাঃ)। উনার কাছে যখন এক আল্লাহর ইবাদাতের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল তিনি বলেছিলেন, আমি তো দুই বছর ধরে এক আল্লাহর ইবাদাত করছি। যখন ইসলাম আত্মপ্রকাশ করেনি তখনো আবু যর ফিতরাহ দিয়ে বুঝেছিলেন আল্লাহ এক এবং কেবল তারই ইবাদাত করতে হবে। যদিও তখনো নামাজের হুকুম ছিল না কিন্তু তিনি নিজের মত এক আল্লাহর ইবাদাত করতেন। সুবহানাল্লাহ!

ইসলামের ব্যাপারে বাকিরা মূলত sign দেখে বুঝে গিয়েছিল ইসলামই সত্য এবং মুহাম্মাদ (সঃ) সত্যিই আল্লাহর রাসূল। আবার অনেকেই ইন্টেলেকচুয়ালিটি আর যুক্তি তর্কের উপর ভিত্তি করে বুঝেছিল ইসলামই সত্য। যেমন আমর ইবনুল আস (রাঃ)। খন্দকের পর থেকে মূলত উনার ভেতর ভাবান্তর তৈরী হচ্ছিল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন গভীরভাবে। আমর ইবনুল আস ইসলামের দিকে ঝুঁকছেন বুঝে কুরাইশ নেতারা তার কাছে লোক পাঠালো। আমর ইবনুল আস সেই লোককে জিজ্ঞেস করলেন, "বলতো সত্যের উপর আমরা, না পারসিক ও রোমানরা?" সে বলল, "আমরা"।

আমর ইবনুল আস বললেন, "এ জীবনের পর যদি আর কোন জীবন না থাকে তাহলে আমাদের এই হক্বের উপর থাকা কি কাজে আসবে? এ দুনিয়াতেই আমরা মিথ্যাশ্রয়ীদের তুলনায় দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আছি আর পরকালেও আমাদের পুরষ্কার লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। একারণে মুহাম্মদের (সঃ) শিক্ষা__'মরণের পর আর একটি জগত হবে, সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মের ফল লাভ করবে'__এটা অত্যন্ত সঠিক ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়"। এরকম ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদও (রাঃ)। এবং আমর ইবনুল আস আর খিলদ বিন ওয়ালিদ একসাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

আবার অনেকেই ছিলেন যারা ইসলামের বিজয় দেখে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন দেখে, ইসলামের শাসন দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর এর মাঝেও দুর্ভাগারা ছিলেন যাদের কোনকিছুতেই হয়নি। যেমন আবু তালিব। রাসূলের প্রতি উনার ভালোবাসার কোন কমতি ছিল না। তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি, ইসলামের বিরোধিতা করেননি। কিন্তু তারপরও আবু তালিব ঈমান আনতে পারেনি।

এখানেই শেষ নয়। আল্লাহ এরপর উম্মাহকে বারবার ফিল্টার পেপারে ছেকে নিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর কথা শোনে অনেক মুসলিম দ্বীন ছেড়ে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, মিরাজের ঘটনা শুনে অনেকে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, মুসায়লামা কাজ্জাবের মত অনেকে ভন্ড নবী দাবি করা শুরু করেছে, অসংখ্য মুসলিম এসব ভন্ড নবীদের দলে ভিড়েছে, অনেকে যাকাত দিতে অস্বীকার করে দ্বীন থেকে বেরিয়ে গেছে। সেই ফিল্টারে ছাঁকন পদ্ধতি কখনো বন্ধ হয়নি তা এখনো চলছে এবং চলবে। মানুষকে একেক সময় আল্লাহ একেক ফিতনায় ফেলেন আর তার দলের মানুষদের ছেকে নেন। ফিতনায় পড়ে প্রথম পর্যায়ে মানুষের ফিতরাত নষ্ট হয়ে যায়, এরপরের ধাপে সে দ্বীনের অজস্র নিদর্শনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখায়, **একসময় নিজের চোখে দেখেও না দেখার ভান করে**।

আল্লাহর এই ফিতনায় ফেলে ফিল্টার পেপারে ছেকে নেওয়ার পদ্ধতিতে অসংখ্য সিনসেয়ার, ঈমানি জজবার মানুষ ধরা খেয়েছে। অতীতেও, বর্তমানেও আর ভবিষ্যতেও ধরা খাবে।

অধঃপতন, রিদ্দা, ইরজা, খুরুজ দ্বীনের এই ব্যাপারগুলো কখনোই একদিনে হঠাৎ করে হয়ে যায় না। এগুলো ক্রমান্বয়ে ঘটে। প্রথমে ফিতরাত নষ্ট হয়, এরপর দ্বীনের নিদর্শনগুলোকে পাশ কাটিয়ে যায়, একসময় তারা দেখেও দেখে না। এরপর আল্লাহ

কি করেন? আল্লাহ তাদের অন্তরের বক্রতা আরো বাড়িয়ে দেন। অনেকটা কাপড়ে কলমের কালি লাগার মত। পানি দিয়ে ধুতে গেলে আরো বেড়ে যায়, আরো বেড়ে যায়।

"তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী" [২:১০]

"তাদের উপমাঃ যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করল; যখন তা তার চতুর্দিক আলোকিত করল আল্লাহ তখন তাদের জ্যোতি অপসারণ করলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, তারা আর কিছুই দেখতে পায় না" [২:১৪]

সুতরাং **হেদায়াত এমন কোন বিষয় নয় যে নিলামে বসে কিছু বছরের জন্য কিনে নিলে!** হেদায়াতের উপর টিকে থাকাকে তোমার পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তি মনে করো না যে, পিতা মারা গেলেও আইন অনুযায়ী তুমি তার মালিক হয়ে যাবে। আল্লাহ কোরআনের এক জায়গায় ক্ষমার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন "grab it" অর্থাৎ একে আঁকড়ে ধরো, এটা এমন কোন বস্তু নয় যে তোমাকে প্লেটে করে সাজিয়ে সামনে দেওয়া হবে। **Grab it, এটা যেকোন সময় পিছলে যেতে পারে**। হেদায়াতও এমন বিষয়।

এটা চিরকাল তোমার থাকবে এমন কোন কথা নেই। এটা ধৈর্য আর তাকওয়ার জিনিস। এখানে দাঁতে দাঁত চেপে আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর শক্ত হয়ে জমে থাকা চাই। এখানে এমন সময় আসবে কোন কিছু তোমার পক্ষে থাকবে না, কেউ তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে না, কেউ তোমাকে রক্ষা করবে না। তুমি অবিচল থেকো। বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য রয়েছে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি।